উৎস মানুষ

৪২বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
জোতীরাও ফুলে	জি পি দেশপাণ্ডে অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী	৩
মড়কের সেকাল	তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী	৬
কোভিড:কুসংস্কার	ভবানীপ্রসাদ সাহু	৯
পরিযায়ী শ্রমিক	শ্রীময়ীঘোষ	১২
বুকে ব্যথা	গৌতম মিস্ত্রী	১৫
বাজার বনাম সরকার	শৈবাল কর	১৯
প্যারেন্টিং	অরুণালোক ভট্টাচার্য	২১
মঘা	সৌমেন মুখার্জি	২৪
রঙের বালতি	সুব্রত গোমেশ	২৮
একুশের বন্যার কান্না	ষড়ানন পণ্ডা	২৯
চোখের সমস্যা	প্রশান্ত চক্রবর্তী	৩১
পুস্তক পর্যালোচনা	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক:http:// www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

নভেম্বর ৩, ২০২১, কালীপুজোর আগের দিন হোয়াটসঅ্যাপে দেখি 'শুভ সকাল' গুড মর্নিং সঙ্গে ফ্রেমের দু-কোনায় কঙ্কালের মুখ। নীচে লেখা 'শুভ ভূত চতুর্দশী' আর প্রতিটি অক্ষরের মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসানো। কেননা ভুতেরা সব নাকী সুরে কথা বলে! আকাশবাণীর 'গীতাঞ্জলি'তে (আগের কলকাতা 'ক') একই দিনে 'আপনার স্বাস্থ্য' অনুষ্ঠানে 'ভূত চতুর্দশীতে চোদ্দ শাক খাওয়া কেন দরকার' তা নিয়ে বলা হল— ঐদিন ভূতেরা সব অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষের নানান অনিষ্টসাধন করে। বিশেষ করে আমাদের শরীরের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আঘাত করে মানুষকে কাবু করে ফেলে। ভূত চতুর্দশীর দিন চোদ্দ শাক খেলে সেই বিপদ হবার ভয় থাকে না। সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক সেই অনুষ্ঠান বেতার মারফৎ নিমেষে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কাছে পৌঁছে গেল। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুললেন।

সম্প্রতি ইউজিসি-র অধীনস্থ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক আদেশবলে টানা একুশ দিন সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে সূর্য প্রণাম করতে বলা হয়েছে। এরকম আজগুবি ঘটনার কথা ইদানিং বেশি করে শোনা যাচ্ছে। বাজির দূষণ, ডিজে বক্সের গুনগুন আওয়াজ— মহামান্য আদালতের নির্দেশে সবই নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা না করাটাই বোধহয় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যমুনা নদীর জল এত দূষিত যে, তাতে রাসায়নিক ফেনার পাহাড়। রাস্তার কল থেকে তোড়ে জল পড়ে যাচ্ছে, কলের মুখ লাগালেই ভেঙে দেয়। বলতে গেলেই তেড়ে আসে, কারো কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সদ্য-সমাপ্ত পৌর নির্বাচনে এই বিপুল পরিমাণ জল অপচয় নিয়ে কোনও প্রার্থী সরব হয়েছিলেন বলে শোনা যায় নি। চূর্ণী এ রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। তার দূষণের মাত্রা এতটাই যে কয়েক বছর আগেও সেখানে গাঙ্গেয় শুশুক দেখা যেত, বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যেত— সেসব আর দেখা যায় না। মাত্রাতিরিক্ত দূষণ ও দখলদারির ফলে কত যে ছোট ছোট নদী-নালা , সেই সঙ্গে জীববৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। মানুষ ও প্রশাসন উদাসীন। পরিবেশপ্রেমী কিছু সংগঠনের প্রতিবাদে ঘটনাগুলো জানা যায়।

মরণোত্তর চক্ষুদান করলে কলকাতা পৌরসভা চক্ষুদাতাকে সম্মান জানাতে শ্মশানের খরচ মকুব করে বলে শোনা যায়।

কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে একটি সংগঠন কলকাতা পৌরসভার উদাহরণ খাড়া করে নিজেদের পৌর এলাকায় যাতে একই নিয়ম চালু করা হয় তার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে লিখিত নিয়ম থাকলে তার কপি সংগ্রহ করে দিতে আমাদের অনুরোধ করা হয়েছিল। আমাদের প্রতিনিধি কলকাতা পৌরসভার খান দুয়েক বোরো অফিস ঘুরে শেষে 'লালবাড়ি'-তে গিয়ে খোঁজ করে জানা যায় যে এরকম কোনও লিখিত নিয়ম নেই। মৃত ব্যক্তির ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধির অনুমোদন নিয়ে পৌরসভার সদর দপ্তরে এসে খরচ মুকুবের অর্ডার নিয়ে শ্মশানে দেখালে তবেই ছাড় মেলে। ইদানিং মরণোত্তর চক্ষুদান নিয়ে বেশ কিছু মানুষ সচেতন হয়েছেন। তাই কলকাতা পৌরসভার এই অ্যাডহক নিয়ম খুবই হতাশাব্যঞ্জক। লিখিত আকারে নিয়ম চালু করা অত্যন্ত জরুরি। কলকাতা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোঁজ নিতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে উত্তর কলকাতার এক শ্মশান কর্মীর আলাপ হয়। জানা যায় অতিমারীর বাড়াবাড়ির সময়ে তিনি এক একদিনে অনেকগুলি মরদেহ (সংখ্যাটা তিরিশের বেশি) সৎকার করেছেন। তাও খালি হাতে! তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বললেন 'কই আমার তো কিছু হয় নি! এই সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে যে লেখা রয়েছে তা বর্তমান সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বেশ কয়েক বছর ধরে নদীতে বা জলাশয়ে ঠাকুর ভাসান নিয়ে বিধিনিষেধ বলবৎ রয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কলকাতা পৌরসভা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে সেখানে ঠাকুর ভাসানের ব্যবস্থা করেছে । কিন্তু আমরা দেখলাম সেখানে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটা ঠাকুর ভাসান দেওয়া হল। বেশিরভাগই হল হুগলী নদীতে। জলদূষণ নিয়ে প্রচার তো কম হল না। তার নিট রেজাল্ট শূন্য! শ্মশানে কাঠের চুল্লিতে সৎকার সংখ্যায় কম হলেও একেবারে বন্ধ হয় নি। পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা কবে গড়ে উঠবে তা জানা নেই। কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে কিছু শোনা যায় না। সামগ্রিক চিত্রটা বেশ হতাশাব্যঞ্জক।

আগে এক-আধজন গ্রাহক সাধারণ ডাকে পত্রিকা পেতেন না। ইদানিং সংখ্যাটা বাড়ছে। বিশেষ করে উত্তর বাংলায়। গতবছরে প্রকাশিত চারটি সংখ্যাই পাননি এমন গ্রাহক বেশ ক'জন। ডাক বিলি না হলে লজ্জা পাওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার থাকে না। সেই গ্রাহককে ফের পত্রিকা পাঠালে একই পরিণতি হবে। তাই পাঠানো হয় না। স্পিড পোস্ট করার অনুরোধ এলে ডাকখরচ আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে বলা হয়।

'কন্যা তো কোনও বস্তু নয় যে দান করতে হবে' এই কথাগুলি লেখা মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে লেখার জন্যে বাবাকে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী মৌলবাদীদের হুমকি শুনতে হল। একই নিমন্ত্রণপত্রে 'কন্যাদান নয়, রক্তদান' লেখার জন্য ভদ্রলোককে কেউ পিঠ চাপড়ান নি। নিজের বিশ্বাস থেকে এমন কিছু লেখা হল যা চালু নিয়মের সিলেবাসে নেই। ব্যস অমনি শুরু হয়ে গেল হুমকি। ঘটনাটি নদীয়া জেলার কোনও এক জায়গার, যা দু-একটি খবরের কাগজে বেরোয়। মানুষের স্বাধীন মতামত, যা সমাজের ক্ষতি করে না, প্রকাশ করলেই হুমকি শুনতে হচ্ছে। যদি কেউ ভেবে থাকেন ওরকম এক-আধটা হয়েই থাকে তাঁরা কিন্তু দোটানায় থাকেন। না বাবা, ওসব হুমকি-টুমকি পাওয়ার থেকে যেমন চলছে চলুক। অতিমারীতে শিশু-কিশোররা স্কুলে যেতে পারে না, পূর্ণবয়স্করা ঘরবন্দি থেকে থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। খবরে প্রকাশ দেশের একটি নামি বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেলের ঘর থেকে সিলিং ফ্যান খুলে নিচ্ছে। উদ্দেশ্য আত্মহত্যা আটকানো। এরই মধ্যে দেশের অন্যতম নামি প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরাণকে বিকৃত করে ক্যালেন্ডার বের করল। যা নিয়ে বিজ্ঞানী মহল প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, একসময় যে সংগঠনটি চিকিৎসার বাণিজ্যকরণ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল, যারা 'মানুষের জন্য ওষুধ, না ওষুধের জন্য মানুষ', 'নিষিদ্ধ ওষুধ' নামে পুস্তিকাগুলি প্রকাশ করেছিল, তাদের প্রাণপুরুষ ডাক্তার অজয়কুমার মিত্র সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। আদর্শবান এই শিক্ষক চিকিৎসক ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের সভাপতি ছিলেন। যাঁরা নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগত জানাতে লাগাতার শব্দবাজি ফাটালেন, ডিজে বক্স বাজালেন, তাদের কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে যে তাঁরা পরিবেশের কতটা ক্ষতি করছেন। বিপদের ঘণ্টা বাজালেও মানুষ সতর্ক হচ্ছে না। এ এক অদ্ভুত সময়ের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। তবু আমাদের কাজটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আসন্ন কলকাতা বইমেলায় আমাদের স্টল থাকবে, উৎস মানুষ প্রকাশনার নতুন বই 'আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি' প্রকাশিত হবে। সবাইকে ইংরেজি নতুন বছরে প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

— পরিচালকমণ্ডলী উমা

বালবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে

মহাত্মা জোতীরাও ফুলে, ৪ ডিসেম্বর ১৮৮৪

অনুবাদকের নিবেদন

নীচের অংশটি অনুবাদ করা হয়েছে জি পি দেশপাণ্ডে সম্পাদিত সিলেক্টেড রাইটিংস অব জোতীরাও ফুলে (লেফটওয়ার্ড বুক্স, নয়া দিল্লি, ২০১৬) থেকে। দেশপাণ্ডেজীর আলোচনা থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আমূল বিরোধী ফুলে নিজের নামের বানান সংস্কৃত নিয়মে জ্যোতি না লিখে প্রাকৃত নিয়মে জোতী লিখতেন। এখানেও য-ফলা বর্জিত বানান অনুসৃত হল।

অনূদিত অংশটির পটভূমি সম্বন্ধে দেশপাণ্ডেজী জানিয়েছেন— *'১৮৮৪র জুন মাসে পার্শি সমাজ সংস্কারক বেহেরামজি মেরোয়ানজি মালাবারি তখনকার বড়োলাট লর্ড রিপনের কাছে ব্রিটিশ সরকারের বিবেচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বালবিবাহ এবং বাধ্যতামূলক বৈধব্য আরোপ সংক্রান্ত দুটি আবেদন পেশ করেন। সরকার সেই আবেদনগুলি বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ওই সময়ের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছেও আবেদন দুটির কপি পাঠানো হয়েছিল। ফুলে তাঁদেরই একজন।'*

তারই প্রতিক্রিয়ায় জোতীরাও নীচে অনূদিত মন্তব্য দুটি লেখেন।

জোতীরাওয়ের মন্তব্য থেকে তিনটি জিনিস বিশেষ লক্ষণীয়।

এক, মালাবারির প্রস্তাব অনুমোদন করে ১৮৮৪ সালে ফুলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুনয় করছেন যাতে বাধ্যতামূলক বৈধব্য ও বহুবিবাহ রদ করা হয়। অথচ এর আটাশ বছর আগেই, ১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে হিন্দুদের বিধবাবিবাহ আইনসম্মত বলে গৃহীত হয়ে গেছে। ফুলে কি সে-খবর রাখতেন না? বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের নামের কোনো উল্লেখও নেই তাঁর লেখায়। এমন কি হতে পারে যে, কট্টর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-বিরোধী ফুলে ইচ্ছা করেই বিদ্যাসাগরের ওই আন্দোলনকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, যেহেতু *হিন্দু* আইন বিশেষজ্ঞ বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুমোদনকে হাতিয়ার করেই বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন?

দুই, ১৮৫৬ সালের ওই আইন নিশ্চয়ই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তিনটি প্রেসিডেন্সিতেই সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। অর্থাৎ মহারাষ্ট্রও সে-আইনের আওতায় পড়ত। তাহলে নতুন করে বিধবাবিবাহ আইন চালু করার প্রয়োজন দেখা দিল কেন?

তিন, আপোশহীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-বিরোধী জোতীরাও এখানে *ব্রাহ্মণ* বিধবাদের পক্ষ নিয়েই সওয়াল করেছেন। শুধু সওয়াল নয়, তাঁদের উপকারার্থে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এটা তাঁর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-বিরোধী সর্বজনীন মানবিকতার পরিচয় তুলে ধরে। যাঁরা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে এই বলে তুচ্ছ করেন (স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও তাঁদের একজন) যে ওটা কেবল উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের সমস্যা, সুতরাং গোটা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যহীন, তাঁরা যেন এ প্রসঙ্গে জোতীরাও-এর যুক্তিগুলি একটু পড়ে দেখেন।

ফুলের নির্বাচিত রচনা সংগ্রহর অত্যন্ত সুলিখিত ভূমিকাটিতে সম্পাদক দেশপাণ্ডেজী লিখেছেন : *'... উনিশ শতকের সংস্কারকদের মধ্যে একজনও তাঁর [ফুলের] মতো সংবেদনশীলতার সঙ্গে লিঙ্গ সমস্যা নিয়ে ভাবেননি। সেই জন্যই তাঁর স্থাপিত প্রথম বিদ্যালয়টি ছিল অতিশূদ্র বালিকাদের জন্য।'*

একথা ঠিক, এদিক থেকে ফুলে ভারতে একটি বিপ্লবেরই সূচনা করেছিলেন। বিদ্যাসগরও লিঙ্গসমস্যা নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছিলেন, কিন্তু তিনি 'অতিশূদ্র' বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেননি। কিন্তু দেশপাণ্ডেজীর পরের মন্তব্যটি আমাদের একটু বিপাকে ফেলে দেয় : *'এর পর তিনি [ফুলে]*

১৮৬০ সালে বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর সমকালের অন্য প্রায় সব সংস্কারকের কাছেই এটা ছিল তত্ত্ব আর সংস্কারের ব্যাপার। কিন্তু ফুলের কাছে এটা ছিল বাস্তবানুশীলন (প্র্যাক্সিস) আর বিপ্লবের প্রশ্ন।'

দেশপাণ্ডেজী এখানে নিশ্চয়ই সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতেই কথা বলছেন; তাহলে জোতীরাওয়ের মতো তিনিও একথা কীকরে বিস্মৃত হলেন যে ১৮৫৬ সালেই অসীম প্রযত্ন ও ক্লেশস্বীকারের মধ্য দিয়ে, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অজস্র বাধা ঠেলে বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহকে আইনসম্মত বলে পাশ করিয়ে নিয়েছেন? এবং বিদ্যাসাগর যে নিছক তত্ত্ব আলোচনা করে ক্ষান্ত হননি, রীতিমতো মাঠে নেমে, আর্থিক ও শারীরিক ঝুঁকি নিয়ে, কাজ করেছিলেন, সেকথা তো ইতিহাস-স্বীকৃত। তাহলে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার চার বছর পরে বিধবাবিবাহ প্রচলনের দাবি জানিয়ে ফুলে কী করে এ বিষয়ে বৈপ্লবিক পথপ্রবর্তক হলেন, সেটা বুঝতে আমরা অপারগ। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ১৮৬০ সালে সে-আন্দোলন শুরু করলেও চব্বিশ বছর পরে, ১৮৮৪ সালেও বিধবাবিবাহ নিয়ে ফুলেকে নতুন করে সরকারের কাছে দাবি জানাতে হচ্ছে। তাহলে কতদূর সফল হল তাঁর আন্দোলন?

এখানে আমরা অবশ্য কেবল প্রশ্নগুলিই তুলছি। উত্তর আমাদের জানা নেই। মহাত্মা জোতীরাও ফুলে নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা যদি এবিষয়ে আলোকপাত করেন, তাহলে খুব ভালো হয়। — অনুবাদক

বালবিবাহ প্রসঙ্গে জোতীরাও ফুলে

আমি মিস্টার বি এম মালাবারির সাধু উদ্যোগের সঙ্গে একমত এবং আশা করি আমাদের আলোকপ্রাপ্ত সরকার নিশ্চয়ই এদেশের মোহগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা দূর করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেবেন। মিস্টার বি এম মালাবারি আর্য শাস্ত্রকর্তাদের দ্বারা উদ্ভাবিত আমাদের এইসব রীতিনীতি ও আচারগুলি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পীড়িত নন, তবু তিনি এত সুন্দরভাবে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন যে, শূদ্রাতি-অতি-শূদ্র এবং ব্রাহ্মণ বিধবাগণ ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন। এই সঙ্গে এদেশের মধ্য ও নিম্নবর্গের লোকেদের, নিপীড়িত মূলবাসীদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য যোগ করতে চাই। বিয়ের সময় বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষর মধ্যে যদি সামান্য কোনো বিবাদ বাধে, তাহলে হতভাগ্য মেয়েটিকে সারা জীবন তার মাশুল গুনতে হয়। বিয়ের পরে মেয়েটির বাপের বাড়ির কোনো ত্রুটি যদি শ্বশুরের নজরে পড়ে, তখন নির্দোষ বালিকাটিকে জাতিচ্যুত মনে করা হয়। বর যদি কনের থেকে বয়সে ছোটো হয়, তাহলে মেয়েটিকে ভালো করে খেতে-পরতে দেওয়া হয় না, তার যত্নআত্তিও করা হয় না, এমনকী তার ধনী পিতামাতার কাছেও থাকতে দেওয়া হয় না। শ্বশুর যদি অজ্ঞ আর গরিব হয়, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত খাওয়াদাওয়ার অভাবে মেয়েটির বাড়বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এক কথায়, সে দিনের পর দিন দিবারাত্রি আমেরিকার ক্রীতদাসের চেয়েও হাড়ভাঙা খাটনি খাটে। অত্যাচারের মাত্রাটা এতই অসহনীয় যে মেয়েটি আত্মহত্যা করে নিজের জীবনের অবসান ঘটাতে বাধ্য হয়; আর গ্রামের প্যাটেল, কুলকার্নি (ঝগড়ুটে) এবং পুলিশকে ঘুষ খাইয়ে এই অপরাধটা অনেক সময়েই চেপে দেওয়া হয়। বরপক্ষের অনেক গরিব পিতামাতাই তাদের পুত্রবধূর এইরকম অকালমৃত্যুর জন্য ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তাছাড়া বধূটির বালক-স্বামী যখন লায়েক হয়, তখন সে আর বধূকে পছন্দ করে না, তার নিজের পছন্দমতো একটি মেয়েকে বিয়ে করে। তাকে একাদিক্রমে একটা, দুটো, তিনটে বা চারটে বিয়ে করতে উৎসাহ দেওয়া হয়, কেননা সেটাই রেওয়াজ। ফলে তার গোটা পরিবারটা হয়ে ওঠে অশান্তি পূর্ণ, গালিগালাজ আর ঝগড়াঝাঁটি সেখানে লেগেই থাকে। এইসব অজ্ঞ মেয়েরা সতীনদের মনে, কখনো কখনো তাদের স্বামীর মনেও বিষ ঢালতে বদ্ধপরিকর হয়। বাংলার হিন্দুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে এ বিষয়ে চমৎকার কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন; তাঁরা মনে করছেন, এগুলি শিক্ষিত শ্রেণির অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করবে। তবে আমার মনে হয়, তাঁদের এইসব প্রস্তাব সর্বজনীন নয়, *যাবতীয় শূদ্র আর অতিশূদ্র শ্রেণির প্রতি তা প্রযোজ্য নয়*, কারণ খুব কম শূদ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, আর অতিশূদ্রদের তো মাতৃভাষার বিদ্যালয়গুলিতেও প্রবেশ করে উচ্চশ্রেণিভুক্ত ছেলেদের পাশে বসে লেখাপড়া করা বারণ। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, আমাদের বিচক্ষণ সরকার বাহাদুর যদি কিছু বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে মধ্য ও নিম্নশ্রেণির এই অজ্ঞ লোকগুলির বোধোদয় হবে না। তার কারণ, তথাকথিত উচ্চশ্রেণির হিন্দুরাই সরকারের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে আসীন, এবং তারা তাদের বিভিন্ন ধূর্ত আর প্যাঁচালো কৌশলে *ধর্ম* আর *রাজনীতি* বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এদের বিপথগামী করবে। অতএব আমার প্রস্তাব, সরকার এমন নিয়ম চালু করুন যাতে ছেলেদের উনিশ বছরের নীচে, আর মেয়েদের এগারো বছরের নীচে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিবাহ করে, তাহলে

বরপক্ষ আর কনেপক্ষর ওপর একটা ন্যায্য জরিমানা-কর ধার্য করা যেতে পারে, আর সেই করের টাকা মধ্য আর নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের শিক্ষার জন্য খরচ করা যেতে পারে। কিন্তু সে-শিক্ষা যেন *ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের* মারফত সঞ্চারিত না হয়; কেননা এরা শিক্ষা দানের সময় ছাত্রদের মাথায় ভুলভাল ধর্মীয় ধ্যানধারণা ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের বিপথগামী করে। আমরা দেখেছি, বানানো ধর্মের ছলে এমনকী সিন্ধিয়া কিংবা হোলকারের মতন করদ রাজাদেরও প্রকাশ্যে ঠকানো হয়েছে। সময়মতো ভাতা না দিয়ে চাষীদের কাছ থেকে যথেচ্ছভাবে কর আদায় করার জন্য তাদের [এই রাজাদের] উৎসাহ দেওয়া হয়। তবে বরোদার বর্তমান মহামহিম রাজা যে অজ্ঞ চাষীদের শিক্ষাদানের ও অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন, এ আশা খুবই বলবতী; কারণ এই মহামহিম রাজা উন্নত সুদৃঢ় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছেন।

ব্রাহ্মণ বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে জোতীরাও ফুলে

এইবার আমি সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে কিছু বলব। সেটি হল, ব্রাহ্মণ নারীদের জবরদস্তি বৈধব্য বরণে বাধ্য করা। আর্যদের সামাজিক প্রথায় অবিবেচকের মতো পুরুষদের বহুবিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তারা নতুন নতুন নষ্টামিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আইনসিদ্ধ স্ত্রীদের ওপর দিয়ে ভোগলালসা চরিতার্থ করবার পর নতুনত্বের খোঁজে তারা বারনারী গমন করতে থাকে। সেখান থেকে তারা নানাবিধ যৌনরোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রচুর টাকা খরচ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়— শুধু নিজেদের অসুখের জন্য নয়, স্ত্রীদের অসুখের জন্যও। চিকিৎসা যখন ব্যর্থ হয়, যখন তারা এবং তাদের পত্নীরা আরোগ্যলাভ করতে পারে না, তখন তাদের সন্তান লাভের সব আশা নির্বাপিত হয়ে যায়। জীবনের এই দুর্দশাপূর্ণ দশায় সেই লম্পট স্বামীটি যদি দেখে, তার স্ত্রী রাতের বেলা বাইরে বেরোচ্ছে, সে তৎক্ষণাৎ ধরে নেয়, তার স্ত্রী কুপথ অনুসরণ করছে। তখন সে কঠোর সাজা দিয়ে স্ত্রীকে মেরেধরে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। বুড়ো হবার পর এই নির্লজ্জ লোকটি নিজের চরিত্রের ওপর থেকে এই কলঙ্ক মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে ধর্মকর্ম করতে থাকে, তার নিজের সন্তুষ্টির জন্য পাথরের মূর্তিগুলির উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে বাজারের বাইজী ডেকে মন্দিরে নাচগান করায়। আর্য সাামজিক প্রথা অনুযায়ী এই বদমাশটির মৃত্যুর পর তার তরুণী সুন্দরী স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই তরুণীর সমস্ত গয়নাগাঁটি খুলে নেওয়া হবে, তার নিকট আত্মীয়রা তার মাথা মুড়িয়ে দেবে, তাকে ভালো করে খেতে দেওয়া হবে না, তাকে ভালো পোশাক পরতে দেওয়া হবে না, কোনো বিয়ে কিংবা ধর্মীয় আনন্দ অনুষ্ঠাড়ে তার যোগ দেওয়া বারণ। বাস্তবিক, সব রকম জাগতিক সুখভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয়, তাকে একজন অপরাধী কিংবা একটা হীন জানোয়ারেরও অধম মনে করা হবে।

উপরন্তু আর্য সমাজবিধি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ পুরুষরা তাদের প্রথমা স্ত্রী বর্তমানেই নিম্নবর্গের মেয়েদেরও বিয়ে করতে পারে; অথচ তারই আপন বোনের প্রথম স্বামীর মৃত্যু হলে মেয়েটির পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। এইসব পক্ষপাতদুষ্ট অন্যায় নিষেধাজ্ঞা অবধাতিরভাবেই অসহায় আর্য বিধবাটিকে ভয়ানক অবর্ণনীয় অনাচারের পথে নিয়ে যায়। আমার এই প্রত্যয়ের প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটির বিবরণ দিচ্ছি। রাও সাহেব সদাশিব বল্লাল গৌন্ডি নামে আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ইনাম কমিশনের অফিসার ছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে কাশীবাঈ নাম্নী এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে রাঁধুনী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। বেচারী কাশীবাঈ ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ঘরের সুভদ্র ও সুন্দরী তরুণী। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ। বেশ কয়েক মাস তিনি আমার ওই বন্ধুর গৃহে কাজ করেছিলেন। বন্ধু মহল্লায় থাকত ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত এক 'শাস্ত্রীবুভা'। অত্যন্ত ধূর্ত ও ধুরন্ধর সেই লোকটি ওই অজ্ঞ নারীকে ফুসলাবার জন্য উঠেপড়ে লাগে। প্রথম প্রথম কাশীবাঈ সে প্রলোভন প্রতিহত করতে পারলেও অবশেষে একদিন লোকটির কামনার শিকার হলেন। তারপরই তিনি গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর নাগরটির পরামর্শে হরেক রকম বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে গর্ভপাত করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল। ন মাস পর, কাশীবাঈয়ের একটি ফুটফুটে ছেলে হল। নিজের অবমাননার কথা ভেবে তিনি সেই নির্দোষ শিশুটিকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে তাঁর প্রভুর বাড়ির পিছনে একটি কুয়োয় ফেলে দিলেন। দুদিন পর সন্দেহবশত পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। পুণার দায়রা আদালতে বিচারের পর তাঁকে দ্বীপান্তর-দণ্ড দেওয়া হল। কাশীবাঈ এই অপরাধটি করেছিলেন এইজন্য যে ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁর চরিত্রে যেন কলঙ্কের দাগ না পড়ে। কাশীবাঈয়ের এই ঘটনাটি থেকে আর্যদের সামাজিক প্রথা যে কত অন্যায় আর পক্ষপাতদুষ্ট, তা এবার লোকের কাছে প্রকট হয়ে গেল। লোকে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। আমার হাতে যথেষ্ট টাকাপয়সা না-থাকা সত্ত্বেও কাশীবাঈয়ের মামলা শেষ হওয়া মাত্র আমি পুণায় আমার

নিজের বাড়ির প্রাঙ্গনে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জন্য একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করতে বাধ্য হলাম। ব্রাহ্মণপাড়ার রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছাপানো পোস্টার লটকে দেওয়া হল। সেই দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত [৪ ডিসেম্বর ১৮৮৪] পঁয়ত্রিশ জন গর্ভবতী ব্রাহ্মণ বিধবা এই আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়েছেন। এখানে তাঁদের বাচ্চা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচজন ছাড়া সকলেই মৃত, যেহেতু গর্ভাবস্থায় তাদের মায়েরা নানারকম বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে নিজেদের পোয়াতি-দশা লুকোতে চেয়ে ভ্রূণের ক্ষতি করেছিলেন। এই ঘৃণ্য ব্যবস্থাটির জন্যই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ঘরের অনেকে সুন্দরী অসহায় অজ্ঞ বিধবা, বারনারী কিংবা রক্ষিতা হয়ে গেছেন। এই আর্য সামাজিক প্রথাটি এতই জঘন্য, এতই ঘৃণ্য, যে ব্রাহ্মণ বিধবারা এমন দুর্দশাপূর্ণ, এমন লজ্জাহীন ধরনে জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। নিছক শোভনতার খাতিরে এ সংক্রান্ত খুঁটিনাটির বিবরণ দিতে আমরা অক্ষমতা প্রকাশ করছি। উপসংহারে আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাদের এই আলোকপ্রাপ্ত ইংরেজ সরকারের কাছে সনির্বন্ধ মিনতি জানানোর অনুমতি চাইছি যে, আর্য ধর্মীয় আচারের এই নির্মম ব্যবস্থাটি অসহায় নারীদের ওপর যে জবরদস্তি বৈধব্যের অত্যাচার নামিয়ে আনছে, সরকার তার অবসান ঘটাক। তাই আমার প্রস্তাব, কোনো নাপিত যেন দুখিনী ব্রাহ্মণ বিধবাদের মাথা মুড়িয়ে দেবার অনুমতি না পায়। পক্ষপাতদুষ্ট আর্য ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহ সেখানে নিষিদ্ধ, অথচ বিপত্নীকদের বিবাহ অনুমোদিত— কেন? বিপত্নীকদের অনুমতি অবশ্যই দেওয়া উচিত? নারী জাতির প্রতি অসূয়া বশতই যে এইসব স্বার্থপর শয়তান আইনপ্রণেতারা তাদের শাস্ত্রগুলিতে এমন সব অন্যায় আবোলতাবোল ধারা যোগ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অনুবাদক : আশীষ লাহিড়ী

উমা

মড়কের সেকাল

তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী

'সুশ্রুত সংহিতা', যার রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক, সেখানে 'মারক' বা 'জনপদধ্বংস'-র উল্লেখ বিশদে পাওয়া যায়। তার মানে মহামারির সঙ্গে ভারতের পরিচয় সুপ্রাচীন। উপসর্গ হিসেবে উল্লেখ আছে জ্বর, সর্দি, মাথাধরা, কাশি ও বমির। এবং নিদান হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে, স্থান পরিত্যাগ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন বা শান্তি কর্ম (গঙ্গাজল বা পূতপবিত্র জল বলতে আসলে বোঝানো হয় স্যানিটাইজারকে), প্রায়শ্চিত্ত, মঙ্গল-জপ-হোম-তপ, ধূপন (ধোঁয়া দিয়ে শুদ্ধিকরণ)। অর্থাৎ ধর্মীয় পূজার্চনা, আচার-অনুষ্ঠানের সাংকেতিক ভাষার পেছনে আসলে লুকিয়ে আছে সংক্রামক অসুখের নিদান। জ্বরাসুর আসলে এক দেবতা, শীতলা দেবী তাঁর স্ত্রী। বঙ্গের অসংখ্য থানে শীতলা, মনসা, দক্ষিণ রায়, আটেশ্বর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে জ্বরের দেবতা পূজা পান।

গ্রিক শব্দ বা Nosos-ও প্যানডোরার বাক্স থেকে পালানো কিছু অপদেবতা। প্রাচীন গ্রিসের চিকিৎসাশাস্ত্রে হিপোক্রেটিক কর্পাস-এর ভেতর পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত গোটা একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছে মড়ককে। গ্রিক ভাষায় epidemeo শব্দটির মানে 'আগমন', মানুষ ও রোগ, দুইয়েরই।

এবার আমরা দেখব এই 'এপিডেমিও' এবং 'নোজোস' গ্রিক সাহিত্যে কীভাবে দাগ কেটেছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী আলেকজান্দার-পরবর্তী গ্রিসের কথা বলছি। সক্রেটিস-প্লেটোর সেই যুগে সফোক্লিস নামে এক কবি ছিলেন। কবি ও নাট্যকার। এই সময়টিকে ধ্রুপদী গ্রিক সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা হয়। কবি হোমারের পরেই বিশ্বব্যাপী সফোক্লিসের খ্যাতির ব্যাপ্তি ও দীপ্তি। ট্যাজেডি বলে যে এক বিয়োগান্তক নাটকের কথা আমরা শুনতে পাই, সফোক্লিস, এস্‌কাইলাস ও ইউরিপিদিস সে-ধারার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আর তাঁর লেখা যে নাটকটি সবথেকে বিখ্যাত, তার নাম 'রাজা অয়দিপাউস'। আমরা ওই নাটকটি নিয়ে কিছু কথা বলব এবার।

'রাজা অয়দিপাউস' নাটকের কথা বলতে গেলে বাঙালি হিসেবে আত্মশ্লাঘা বোধ হয়। কারণ, নাটকটিকে যিনি বঙ্গের নাট্যমঞ্চে চিরস্থায়ী স্থান দিয়ে গেছেন, নাটকটি বঙ্গসংস্কৃতির আপন ঐশ্বর্য বনে গেল যাঁর দৌলতে, কিংবদন্তি নট ও নাট্যকার শম্ভু মিত্র বাঙালি জাতির গৌরব। আমার মতো মধ্যবয়স্ক যাঁরা, এই নাটকের মঞ্চায়ন দেখার সুযোগ তাঁদের সবার নাও হতে পারে, কিন্তু এর বেতার নাট্যরূপটি শোনেননি এমন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা বঙ্গসমাজে বিরলই বলা যায়।

বিশ্ববিশ্রুত এই নাটকের কাব্যগুণ, নাট্যগুণ ও মনস্তত্ব নিয়ে তো অনেক কথা হল। ইদানীং এই নাটকের গবেষণামূলক আরেকটি ব্যাখ্যা আমাদের

নজরে এসেছে। যার ফলে নাটকটি এই আজকে, বিশ্বব্যাপী এই করোনা মহামারির সংকট-কালে অন্য এক রকমের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে।

বস্তুত গবেষণার কালটি নির্দেশ করতে 'ইদানীং' শব্দটি যে ব্যবহার করলাম, তা নাটকটির প্রাচীনতার সাপেক্ষে। আমাদের আলোচ্য তত্ত্বটি ভূমিষ্ঠলাভ করেছে প্রায় এক দশক আগে। গ্রিসের কয়েকজন ডাক্তারের একত্রিত প্রয়াসে একটি গবেষণা পত্রে সেটি প্রকাশিত হয়েছে Emerging Infectious Diseases বলে এক ডাক্তারি জার্নালের জানুয়ারি ২০১২-এর সংখ্যায়। গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে নাটকটির যুগপৎ ঐতিহাসিক ও ডাক্তারি একটি পাঠ।

কিন্তু প্রথমে নাটকের প্লটটা একটু জানা দরকার। অয়দিপাউসের জন্মের আগে তার বাবা লাইয়স ও মা ইয়োকাস্তাকে দেবতারা বলেছিলেন তাঁদের যে পুত্র হবে সে পিতৃহন্তা ও অজাচার এই দুই পাপে লিপ্ত হবে। সে নিজেও কলুষিত হবে এবং দেশকেও কলুষিত করবে। ফলে, লাইয়স পুত্রের জন্মের পরই তাকে লোক দিয়ে দেশের বাইরে বহুদূরের এক পাহাড়ে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে এলেন। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডায় কে? বড়ো হয়ে অয়দিপাউস ঘটনাচক্রে নিজের দেশে ফিরে বাবাকে খুন করে মাকে বিয়ে করে বসলেন। দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে মারিকে পাঠালেন দেশকে ছাড়েখাড়ে পাঠাতে। নাটক শুরু হচ্ছে অয়দিপাউস ও থেবেইয়ের নাগরিকবৃন্দের মধ্যে সংলাপ বিনিময় দিয়ে—

> *অয়দিপাউস বলছেন, "প্রাচীন কাদমসের বংশধর, হে আমার থেবাইয়ের প্রজাবৃন্দ, তোমরা সবাই আমাকে কী প্রার্থনা জানাতে এসেছ? ওদিকে নগর থেকে যখন আর্তহাহাকারের শব্দ, আর ধূপের গন্ধের সঙ্গে প্রার্থনার আকুল মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে, তখন তোমরা এই প্রার্থীর পল্লব ধারণ করে প্রাসাদদ্বারে এসে নতজানু হয়ে বসেছ কোন আবেদন জানাতে''।*

উত্তরে থেবেইয়ের প্রবীণ এক নাগরিক বলছেন, ''প্রভু, আমাদের দেশের রাজা অয়দিপাউস, আজ আমাদের নগরী মুমূর্ষু। তার মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কোথা থেকে এক মৃত্যুর অভিশাপ এসে আমাদের ফলন্ত গাছগুলোকে স্পর্শ করে, তাদের গ্রাস করে, তাদের শীর্ণ করে দিয়েছে, আমাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে গ্রাস করেছে, আমাদের নারীদের গর্ভে প্রবেশ করে তাদের বন্ধ্যা করে দিয়েছে। এক নৃশংস রাক্ষসের মত ওই মহামড়ক এই নগরীতে তাণ্ডব শুরু করেছে... ঝাঁকে ঝাঁকে থেবাইয়ের মানুষ ডানা মেলে নরকের দিকে উড়ে যাচ্ছে, অদম্য আগুনের থেকেও দ্রুত..." (অনুবাদ/ শম্ভু মিত্র)

তবে এই মড়কের আভাস-ইঙ্গিত নাটকের পশ্চাৎপটটুকুই রচনা করছে শুধু। নাটকের প্রথম ভাগে মড়কের বর্ণনার প্রাধান্য থাকলেও কাহিনি যত সামনের দিকে গড়াবে ক্রমশই তা পেছনের দিকে সরতে থাকবে এবং মঞ্চের কেন্দ্রস্থল দখল করবে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের টানা-পোড়েন, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত। কিন্তু নাটকের সূচনার এই আভাস-ইঙ্গিতে ভর করেই সন্দর্ভ রচয়িতারা মড়কটিকে চিহ্নিত করার প্রয়াস করেছেন। নাটকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা টুকরো ক্লুগুলি জুড়ে জুড়ে গোয়েন্দাদের মতো পুনর্নির্মাণ করেছেন ২৫০০ হাজার বছর আগের এক মহামারিকে।

সন্দর্ভের একদম গোড়ায় গবেষকরা তাঁদের উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরেছেন

''আমাদের উদ্দেশ্য 'রাজা অয়দিপাউস'-এ যে মড়কের উল্লেখ আছে তা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন কিনা, তা বোঝার চেষ্টা করা এবং থুকিদিদিস বর্ণিত আথেন্সের মড়কের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা। থুকিদিদিসের ঐতিহাসিক বর্ণনা সত্য হলে, এই মড়ক লেগেছিল নাটকটির সৃষ্টি মুহূর্তে। সবশেষে আমাদের উদ্দেশ্য যে জীবানু এই মড়কের কারণ তাকে চিহ্নিত করা"।

অর্থাৎ তাঁরা চেষ্টা করছেন নাটকে মড়কের বর্ণনা বিশ্লেষণ করে তার একটা ক্লিনিকাল চিত্র পাঠকের সামনে হাজির করা, তার সম্ভাব্য কারণ খোঁজার চেষ্টা করা, ও তার আরোগ্যের সম্ভাবনাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা।

প্রথমেই তাঁরা চেষ্টা করছেন মড়কের বর্ণনা বিশ্লেষণ করে তার একটা ক্লিনিকাল চিত্র পাঠকের সামনে হাজির করা, তার সম্ভাব্য কারণ খোঁজার চেষ্টা করা ও তার আরোগ্যের সম্ভাবনাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা। প্রথমেই আমরা দেখছি মড়ক 'গৃহপালিত পশুগুলোকে গ্রাস করেছে'। অর্থাৎ যে রোগটি থেকে মড়কের উৎপত্তি, সেটি অবশ্যই *জুনোটিক*। অর্থাৎ কোভিডের মতই তার উৎস পশুশরীর, বা বলা ভাল, পশু থেকে মানুষ ও মানুষ থেকে পশু তার দ্বারা দুদিকেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এবং আজকের কোভিডের মতই যে তা একাধারে অতিসংক্রামক ও প্রাণঘাতী বর্ণনা থেকে তা বুঝতেও অসুবিধা হয় না।

সংলাপের মধ্যে বলা হচ্ছে মাটি ও চাষজমির অবনতির কথা। গাছের ফল বা মুকুলের মাধ্যমেও মড়ক সংক্রমিত হতে পারে। রোগের উপসর্গের মধ্যে উল্লিখিত হচ্ছে নারীদের গর্ভপাতের কথা, বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গও আসছে।

'একের পর এক আমাদের শহরগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে', নাগরিকবৃন্দের এই সংলাপ শুনলে বোঝা যায় থেবাইয়ের বাইরের অন্য কোনো শহরের বা পাশের শহর আথেন্সের মড়কের খবরও আছে তাদের কাছে।

এরপর নাটকের বিবেকের (কোরাস) সংলাপে শোনা যায় যুদ্ধের দেবতাকে শাপান্ত করতে। নাটকে যুদ্ধের দেবতার প্রসঙ্গ একবারই এসেছে শুধু। কিন্তু একবারই বা কেন আসবে? তাহলে তখন যুদ্ধের দামামা বেজেছিল কি কোথাও?

যুক্তির সপক্ষে তাঁরা গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিদিদিসের শরণ নিয়েছেন। 'পেলনিসের যুদ্ধের ইতিহাস'-এ থুকিদিদিস আথেন্সের রহস্যময় মারির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে সফোক্লিসের বর্ণনায় থেবেইয়ের মহামারির প্রায় হুবহু মিল। ঐতিহাসিক বিবরণ ও নাটকের কাহিনি দু'জায়গাতেই মারির নিদান হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে দৈবকৃপা। দুটি রচনাতেই মারির ফলশ্রুতিতে পশুর রোগ ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। দুটিতেই উল্লিখিত হয়েছে অজস্র লোকক্ষয়ের। তবে সফোক্লিস নারীর গর্ভযন্ত্রণার কথা বলছেন এবং থুকিদিদিস বলছেন যোনিপথ ও পেটের প্রদাহের কথা (লোকগুলো মরে গেল... স্রেফ অন্তরপ্রদাহে... তারপর রোগটা পেটের ভেতর আরো নীচের দিকে নেমে এল, ফলে সেখানে সৃষ্টি হল ভয়ংকর এক ক্ষত, আর তার সঙ্গে উদরাময়)। যেহেতু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে আর কোনো মড়কের নির্দশ লিপিবদ্ধ হয় নি তাই ধরে নিতে হবে সফোক্লিসের থেবেইয়ের মড়ক ও থুকিদিদিসের আথেন্সের মড়ক এক ও অভিন্ন। উল্লেখ্য থুকিদিদিসের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। অতএব ওই মড়কে আথেন্সেকে উজাড় হতে নিশ্চয়ই স্বচক্ষে দেখেছেন সফোক্লিস। অতএব ওই মড়কে আথেন্সেকে উজাড় হতে নিশ্চয়ই স্বচক্ষে দেখেছেন সফোক্লিস।

এই মড়ক থেকে আরোগ্যের কি কোনো নিদান ছিল না? কোনো ওষুধ বা বিশেষ যত্ন? অবশ্যই না। নয়তো কেন বারবার দৈবকৃপা, দৈবাজ্ঞার কথা উঠছে?

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে। এটি এমন একটি রোগ যার কোনো নিদান নেই। এমন একটি রোগ যা গাছে, মাটিতে, গৃহপালিত পশুতে ছড়ায়। এই সমস্ত রোগলক্ষণ বা উপসর্গ এক জায়গায় করলে তা কি আদৌ বিশেষ কোনো রোগের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে? যদি তা করে তো কোন জীবকণা থেকে তার উৎপত্তি?

বেশ কিছু সংক্রামক রোগের তালিকা থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে শেষমেশ পাঁচটি রোগের ওপর তাঁরা আলোকপাত করেছেন। *লাইশমেনিয়া, লেপটোস্পাইরা, ব্রুসেলা অ্যাবরটস, অর্থপক্স,* এবং *ফ্র্যানসিজেলা টুলারেন্সিস*। তারপর সেই সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে বাকি চারটিকে বাদ দিয়ে যে রোগটি চিহ্নিত করেছেন, তার নাম *টুলারিমিয়া*, *ফ্র্যানসিজেলা টুলারেন্সিস* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে যার উৎপত্তি। ইঁদুর বা খরগোসের গায়ের পোকা থেকে ছড়ায় এই ব্যাকটেরিয়া। *অর্থপক্স ভাইরাস* এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ গুটিবসন্ত জন্তুজানোয়ারের হয় না। *লাইশমেনিয়াসিস* বা *ক্যালকাটা আলসার* খুব একটা সংক্রামক রোগ নয়, *লেপ্টোস্পাইরোসিস* বা ইঁদুর জ্বরও ইঁদুর থেকে সংক্রমিত হয়, অতএব তার সম্ভাবনাও এক্ষেত্রে নাকচ। সমস্ত সম্ভাবনা বাতিল করতে করতে তাঁরা উপনীত হলেন অবশেষে *ব্রুসেলোসিস* বা *রক ফিভার* নামের এক রোগে। একরকম জ্বর যা মানুষেরও হয়, আবার গৃহপালিত পশুরও হয়। এর আরেক নাম *মেডিটেরিনিয়ান ফিভার*। অনেকেই হয়তো শুনে থাকবেন। কয়েকজন প্রাণীবন্ধুর *ব্রুসোলোসিসে* আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছুদিন আগেই বাংলা সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। সফোক্লিসের সমসাময়িক গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রিটিসের আমল থেকে মেডিটেরিনীয় উপত্যকায় এই রোগের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। নারীদের দেহে সংক্রমিত হলে এই রোগ থেকে গর্ভপাত হতে পারে। নারী বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। একটাই শুধু সমস্যা, এই রোগের মারণ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের হারও অপেক্ষাকৃত কম। বিজ্ঞানীদের মতে, এই *ব্রুসেলা অ্যাবরটস* নামক জীবকণার প্রাচীন স্ট্রেনটি তাহলে নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী ছিল, কালে কালে তার শক্তি ক্ষয় হয়েছে।

২০০৬-এ আরেকটি গ্রিক গবেষণা থুকিদিদিস বর্ণিত আথেন্সের মড়কটির সত্যতা প্রমাণ করেছিল। আথেন্সে প্রকাণ্ড এক গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। কবরটি খ্রিস্টজন্মের প্রায় সাড়ে চারশ বছরের আগেকার। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া দাঁতের অবশেষ পরীক্ষা করে তার মধ্যে *সালমোনালা* নামের এক ধরনের টাইফয়েড জ্বরের ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। যদিও পরবর্তী একটি মার্কিন

গবেষণায় এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, বলা হয় জীবকণাটি আদপে হাল-আমলের।

আসলে, যে কোনো গবেষণায় গন্তব্যের থেকে অভিযান, তার যাত্রাপথ, অনেক বেশি অর্থবহ ও রোমহর্ষক। গবেষণাজাত প্রতিটি সিদ্ধান্তই তো কখনো না কখনো ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং হবেও। তা বলে অন্ধকারে হাতড়ে পথ-হাঁটা তো থেমে থাকছে না কেন? প্রকৃত সত্য হল, আমরা তো সত্যের দিকে পথ হাঁটছি না। রাজা অয়দিপাউস ও ভিখারি অয়দিপাউস, দূরদর্শী অয়দিপাউস ও অন্ধ অয়দিপাউস— আমরা পথ চলেছি অবধারিত অথচ সুমহান এক মিথ্যের উদ্দেশে।

Reference:

The Plague of Thebes, a Historical Epidemic in Sophocles' Oedipus Rex byAntonis A. Kousoulis, Konstantinos P. Economopoulos, Effie Poulakou-Rebelakou, George Androutsos, and Sotirios Tsiodras
Emerg Infect Dis, Jan18(1):153-7, 2012.

উমা

মৃতদেহ থেকে কোভিড — এক আধুনিক কুসংস্কার

ভবানীপ্রসাদ সাহু

শরৎচন্দ্রের লালু সারারাত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে শ্মশানে মৃতদেহের সঙ্গে একই খাটিয়ায় একই কাঁথার নীচে কাটিয়েছিল। এটা হয়তো নেহাৎই গল্প। কিন্তু গল্পে বাস্তবের কিছু প্রতিফলন ঘটেই। এখন বৈদ্যুতিক চুল্লির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে হয়তো কিছু কমেছে, কিন্তু এই কিছুদিন আগেও, গ্রামে শহরে মৃতদেহকে নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন, ছুঁয়ে থাকতেন, জামাকাপড় পাল্টে দিতেন। মুসলিমদের মধ্যে কবর দেওয়ার আগে মৃতদেহকে স্নান করানোর প্রথা আছে; যাঁরা স্নান করান তাঁরা খালি হাতেই তা করেন। হিন্দুরা অবশ্য মৃতদেহে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ক্ষান্ত হন। যাই হোক ঐ সব মৃত ব্যক্তিরা অনেকেই থাকতেন নানা জীবাণু-ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত। কিন্তু সাধারণভাবে ঐ সব মৃতদেহ থেকে অজস্র শ্মশানযাত্রী (বা কবরযাত্রী) দলে দলে সংক্রমিত হয়েছেন, এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি বা আশঙ্কাও করে নি কেউ। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন কলেরার মতো কিছু রোগে মৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। কিন্তু কোভিড-১৯-এ মৃত ব্যক্তির থেকে কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? এর উত্তরে বলা যায়— না, অথবা প্রায় শূন্য।

অথচ আমরা কোভিড অতিমারির আবহে সৃষ্টি হওয়া (অথবা সৃষ্টি করা) তীব্র আতঙ্ক আর মাত্রাছাড়া সতর্কতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দেখলাম— কোভিড-এ মৃত ব্যক্তি দেহটিকে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বা পিপিই-তে সর্বাঙ্গ মুড়ে, যিনি নিয়ে যাচ্ছেন বা আশোপাশে যাচ্ছে তিনিও মহাকাশচারীদের মতো নিশ্ছিদ্র পিপিই পরে, দূর থেকে কখনো বা লাঠি দিয়ে ঠেলে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করছেন। আত্মীয়স্বজনদের ঐ মৃতদেহ ছুঁতে দেওয়া দূরের কথা, দেখতেও দেওয়া হচ্ছে না। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাসপাতালগুলিতে পর্যন্ত এ ধরনের মাত্রাছাড়া সতর্কতা হাস্যকরভাবে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আদৌ এত বেশি সতর্কতার কোনো প্রয়োজন ছিল বা আছে কি? নাকি নিছকই আতঙ্ক? নানা দিক বিচার করে বোঝা যায়, বিজ্ঞানের চেয়ে আতঙ্কই বেশি।

কোভিড-১৯ রোগটির পেছনে যে, সার্স কোভ-২ ভাইরাস (সাধারণভাবে যা 'করোনা ভাইরাস' নামে পরিচিত) সেটি শরীরকে আক্রমণ করে শুধুমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করার ফলে। অর্থাৎ নাক বা মুখ দিয়ে। তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে চোখ দিয়েও যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

একটি হিসেবে দেখা গেছে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য ১০০০টি ভাইরাস-পার্টিকল্ (ভিপি) প্রয়োজন হয়। করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত ব্যক্তির শ্বাসের সঙ্গে বেরোয় প্রতি মিনিটে মাত্র ২০টি, আর কথা বলার সময় প্রতি মিনিটে মাত্র ২০০টি। কিন্তু কাশি বা হাঁচির সময় বেরোতে পারে প্রায় ২০ লক্ষ।

সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, একজন মৃত ব্যক্তির শ্বাসও নেয় না, কথাও বলে না, কাশি বা হাঁচি তো দূরের কথা। অর্থাৎ কোভিডে মৃত ব্যক্তির শ্বাসতন্ত্র থেকে একটি ভাইরাসও বেরোয় না, যে কিনা সুস্থ কারোর শরীরে ঢুকে যাবে। এ কারণে কোভিডে

মৃত ব্যক্তি থেকে রোগটি ছড়ানোর সম্ভাবনার সিংহভাগটাই পুরোপুরি শূন্য। কোভিডে মৃত ব্যক্তির শ্বাসতন্ত্র থেকে করোনা ভাইরাস অন্যের শরীরে একমাত্র তখনই যেতে পারে, যদি সদ্যমৃত এমন ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য কোনো চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী তার উপর ঝুঁকে তার বুকের পাঁজরে জোরে জোরে বারংবার চাপ দিয়ে ফুসফুস-হৃদপিণ্ডের কাজ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তখন ঐ চাপে হয়তো ভাইরাসে থিকথিক করা ফুসফুসের হাওয়া মৃতব্যক্তির নাক মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ইমার্জিন্সি ক্ষেত্রে সদ্যোমৃতদের অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের চেষ্টা চালানোও হয় (কার্ডিও-পালমোনারি রিয়াসিটেশান)। কিন্তু সাধারণভাবে কোভিডে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি করা হয় বলে জানা নেই। আর যদি মুখে উপযুক্ত মাস্ক ভালো করে পরে কোনো চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী তা করেনও তবে সে ক্ষেত্রেও তাঁর নাকমুখ দিয়ে করোনা ভাইরাস শরীরে ঢোকার সম্ভাবনা ন্যূনতম হয়ে যায়। চারাপাশের অন্যান্য লোকজন বা শোকগ্রস্ত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের ক্ষেত্রে তা তো একেবারেই নেই।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই সাধারণ চিত্রটি থেকে এটিও স্পষ্ট যে, কোভিড রোগ তথা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে মাত্রাছাড়া সতর্কতার যে পরিবেশ একসময় সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা অন্তঃসারশূন্য। কোভিডে আক্রান্ত বা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হতে পারেন এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে বদ্ধ ঘরে (যেমন এসি চালানো মিটিং-এ), বদ্ধ বাসে বা সিনেমা হলে বেশ কিছুক্ষণ থাকলেই সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই সম্ভাবনাও অনেকটাই কমে যায় যদি উভয়েই উপযুক্ত মাস্ক পরে থাকেন। আর খোলামেলা, বায়ু চলাচল করা জায়গায় সংক্রমণের সম্ভাবনাও কম, মাস্ক পরলে তা প্রায় শূন্য।

অথচ বাস্তবত দেখা গেছে, একই হাউসিং-এ অন্য ফ্ল্যাটে থাকা কোভিড-পজিটিভ ব্যক্তিকে বাড়ি ছাড়া না করা পর্যন্ত (তিনি কোনো তীব্র লক্ষণে হাসপাতালে যাওয়ার মতো না হলেও) অন্যদের শান্তি নেই।বেলেঘাটা কোভিড হাসপাতালে শুধু কাজ করেন বলে মহিলা কর্মচারিকে বহু দূরের গ্রামের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির লোকজনকেও অস্পৃশ্য (প্রায় শত্রুস্থানীয়) ভাবা হচ্ছে— এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা। সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক, আতঙ্কগ্রস্ত এই ধরনের মানসিকতা এক ভিন্ন ধরনের অর্বাচীন কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। এই কুসংস্কারচ্ছন্ন মানসিকতাই প্রসারিত হয়ে কোভিডে মৃত ব্যক্তির নিষ্প্রাণ দেহটিকেও ছাড় দেয় নি।

(এই অমানবিকতা প্রসারিত হয়েছিল অন্য দিকেও। যেহেতু চীনে প্রথম কোভিড রোগী তথা করোনা সংক্রমণের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল, তাই চীনাদের মতো দেখতে অর্থাৎ মঙ্গোলীয় ধাঁচের মণিপুরি, অসমীয়া, গোর্খা লোকজন, নার্স ও দোকানদারদেরও করোনা ভাইরাস ছড়ানোর জন্য দায়ী করে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে এবং এই অ-কাজকে দেশ রক্ষার বা জনসেবার কিংবা জাতীয়তাবাদের পরিচয় হিসেবে মনে করা হয়েছে। কলকাতার বাস থেকে বেঙ্গালুরুর আবাসন, দিল্লির বাজার থেকে হাসপাতালের কোয়ার্টার, নানা ক্ষেত্রে এমন নির্লজ্জ হিংস্র কুসংস্কারচ্ছন্ন বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি।)

কোভিডের ক্ষেত্রে এমন অর্বাচীন কুসংস্কার আমরা দেখেছি কয়েক দশক আগে এইচ আই ভি সংক্রমণ তথা এইডস রোগটিকে ঘিরেও। তখন কারোর এইডস হয়েছে শুনলে তার পরিবারশুদ্ধ সবাইকে বিতাড়িত করা হয়েছে, এইডস রোগীর সন্তানসন্ততিদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে, তাদের বাজারহাট করতে দেওয়া হয় নি। অথচ কোনোভাবে রক্তের সংযোগ ছাড়া এইচ আই ভি ছড়ায় না; পাশাপাশি থাকলে, কথা বললে, একই থালায় খেলে, একই কাপড় পরলে, একই বাসে-ট্রেনে গেলে — এ রোগ কোনোভাবেই ছড়ায় না। একইভাবে কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বদ্ধ ঘরে না থাকলে, ঐ ব্যক্তি পাশ দিয়ে গেলে, খোলামেলা জায়গায়, বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা থাকা খোলা পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করলে, এ ধরনের কোনো ক্ষেত্রেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা ন্যূনতম; সতর্কতা হিসেবে বড়জোর অপরিচিত লোকজনের কাছাকাছি থাকলে মাস্ক পরা যায়। এক সময় ভাবা হত ভাইরাসটি কয়েক ফুটের বেশি ছড়ায় না, তাই কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তা বায়ুবাহিত অর্থাৎ দূরেও ভেসে যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও খোলা জায়গায় তার ঘনত্ব কমে আসে, অর্থাৎ নেহাৎ বাজারে, ট্রেনে, বাসে, মন্দিরে, মেলায় অর্থাৎ থিকথিকে ভিড় জায়গা ছাড়া ভাইরাসটি থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না--- এসব জায়গায় মাস্কই একমাত্র সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে। আমাদের মতো দেশে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা তো বাস্তবত অসম্ভব এবং মাস্ক পরলে তার প্রয়োজনও নেই। (অন্যদিকে তথাকথিত

সামাজিক দূরত্ব বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং-এর নিদান তো একটি ভ্রান্ত অমানবিক ফতোয়া।)

ভাইরাস প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, এটি জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার মতো নয়, এটি জীবিত কোষ ছাড়া টিকে থাকতে ও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না।

সাধারণত মাত্র চার ঘণ্টা, অর্থাৎ মৃতদেহে করোনা ভাইরাস কেন, যে কোনো ভাইরাসই চার ঘণ্টার বেশি বাঁচতে পারে না। সাধারণত মৃত্যুর পর কমপক্ষে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে মৃত্যুশংসাপত্র (ডেথ সার্টিফিকেট) দেওয়া হয় ও মৃতদেহ ছাড়া হয়। স্পষ্টতই কোভিড হোক বা অন্য কোনো ভাইরাস-ঘটিত রোগে মৃত ব্যক্তির শরীর চার ঘণ্টার পরে সম্পূর্ণ নিরাপদ। অন্যান্য রোগে মৃত ব্যক্তির থেকে কোভিডে মৃত ব্যক্তির আলাদা বিধিনিষেধ নেই। এই বিচারেও কোভিডের মৃতদেহকে চাপাচুপি দিয়ে, আত্মীয়স্বজনের হাতে না দিয়ে, বিরাট একটা কিছু স্বাস্থ্যসম্মত কাজ করা হচ্ছে এমন ভান করে যা সব করা হয় তা একটি হাস্যকর ও নির্মম কুসংস্কারের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বারংবার মনে রাখা দরকার মৃত্যুর পর মৃত কোষগুলিই পরোক্ষে ভাইরাসকে হত্যা করে তার টিকে থাকার ও সংখ্যাবৃদ্ধি করার পরিবেশটিকে ছিন্ন করে দিয়ে। আর তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

তবে তর্কের খাতিরে এটিও মনে রাখা দরকার যে কোনো জড়বস্তুর উপরে চার ঘণ্টার বেশি বেঁচে না থাকলেও কাঁচ, ধাতু বা প্লাস্টিকের মতো চকচকে কোনো কিছুর উপর ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাইরাস টিকে থাকতে পারে। যেমন চশমার কাঁচ, ঘড়ি বা চুড়ি, আয়না, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে। শুধুমাত্র এ কারণেই করোনা ভাইরাসের তীব্র সংক্রমণের আবহে, এসব নিয়ে বাইরে বেরোলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এগুলিকে 'স্যানিটাইজ' করার কথা বলা হয়। 'এই স্যানিটাইজারের অতি ব্যবহারও অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং বিশেষ কিছু লোকের মধ্যে সেটিই এক ধরনের মানসিক রোগের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তবে এটি অন্য প্রসঙ্গ।) মৃতদেহ প্রসঙ্গে বলা যায় 'তিনি' সেজেগুজে ঘড়ি আংটি গয়না পরে শ্মশানে বা কবরে বেড়াতে যাচ্ছেন না যে 'তাঁর' ওগুলি থেকে অন্যান্যদের শরীরে ভাইরাস ঢুকে যাবে। সাধারণত কোনো মৃতদেহে এগুলি থাকে না। যদি ঘটনাচক্রে থাকে তবেই একমাত্র কিছু সতর্কতা নিয়ে (যেমন হাতে গ্লাভস ও মুখে মাস্ক পরে) খুলে নিয়ে স্যানিটাইজার দেওয়া যায়। বড়জোর এটুকুই। আর শুধু এটুকুর জন্যই কোভিডে মৃত ব্যক্তির ঐ দেহটিকে অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ, ভয়ংকর বা 'অভিশপ্ত আতঙ্ক' জাতীয় কোনো কিছু হিসেবে দাগিয়ে দেওয়াটা চূড়ান্ত মূর্খামির নিষ্ঠুর বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

এই সতর্ককতার ক্ষেত্রে বড় কথা হল মৃতদেহকে, বিশেষ করে তাঁর শরীরে থাকা ঐ ধরনের কোনো মসৃণ চকচকে পদার্থকে ছোঁয়ার পর নাকে-মুখে-চোখে হাত না লাগিয়ে সাবান দিয়ে ধুলেই ঐ যদি কিছু ভাইরাস লেগে থাকে সেই ভাইরাস নিষ্ক্রিয় ও দূর হয়ে যাবে। অনেকের মধ্যে যেমন মৃতদেহকে অশুচি ভেবে মৃতদেহ ছুঁলেই স্নান করতে হবে জাতীয় কুসংস্কার আছে, তার কথা বলা হচ্ছে না। ঐ দেহের সংস্পর্শে আসা হাতটিকে বড়জোর ধুলেই যথেষ্ট। এই হাত ধোয়া শুধু কোভিড বলে নয়। ছোটবেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষাতেই আমরা পড়েছি হাত ধোয়ার গুরুত্বের কথা। সেটাই মানতে হবে এবং তা শুধু কোভিড বলে নয়, অন্যান্য রোগের প্রসঙ্গেও প্রাসঙ্গিক। হাত ধুয়ে রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে মানুষের বিজ্ঞানসম্মত সচেতনতা অবশ্য বেশি দিনের নয়, মাত্র ১৫০ বছরের। কিন্তু তাতেই আমরা জেনেছি, শুধুমাত্র বাইরে থেকে ফিরলে ও খাওয়ার আগে ভাল করে হাত ধুলেই কলেরা, টাইফয়েড, পোলিও, ডায়ারিয়া, জণ্ডিস (হেপাটাইটিস-এ) জাতীয় বহু ভয়াবহ রোগকে প্রায় সম্পূর্ণ আটকানো যায়, বহু মৃত্যু এড়ানো যায়।

একইভাবে বাইরে বেরোলে শুধু ঠিকমত মাস্ক পরলেই যক্ষ্মার মতো নানা জীবাণুঘটিত রোগ বা কোভিড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত ইত্যাদি মতো ভাইরাসঘটিত রোগ অথবা হাঁপানি, অ্যালার্জি, সর্দি ইত্যাদির মতো ধূলিকণাঘটিত রোগ আটকানো সম্ভব। (যে কারণে ছোটবেলা থেকে মাস্ক পরার চিরাচরিত অভ্যাসের কারণে, নিউইয়র্কের চেয়েও আড়াইগুণ ঘনবসতিপূর্ণ শহর টোকিও-তে কোভিডে সংক্রমণ ও মৃত্যু তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অবশ্য সঙ্গে করমর্দন না করার অভ্যাসের মতো আরো নানা কিছুই কিছু ভূমিকা পালন করেছে।)

কোভিড-এ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ প্রসঙ্গে কিছুটা ভিন্ন দিকে সংক্ষেপে এসব কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটি নিশ্চিতভাবে জানা যে, ঐ মৃতদেহের কাছে গেলে মাস্ক পরা আর ছোঁয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া— শুধুমাত্র এই দুটি সতর্কতাই যথেষ্ট। আবারও বলা দরকার মৃতদেহের শ্বাসতন্ত্র থেকে যেহেতু ভাইরাস বেরোয় না, তাই মাস্ক পরার

আসল উপযোগিতা ঐ শরীরে তখনও লেগে থাকা সামান্য কিছু ভাইরাস যদি সক্রিয় থাকে, তার জন্য। যদিও সেক্ষেত্রে ভাইরাসের সংখ্যা (ভাইরাস লোড) খুবই কমে যায়। আর খালি হাতে ঐ দেহ ছোঁয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিষ্প্রাণ শরীরে যদি সামান্য কিছু ভাইরাস লেগে থাকে, তা হাতে লেগে গেলে দূর করার জন্য। হাত ধোয়ার এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা আগের সার্স ভাইরাসের উপর একটি পরীক্ষা থেকেও আঁচ করা যায়। যেমন দেখা গিয়েছিল সুতির কাপড়ের উপর কম ভাইরাস লোড সাধারণত পাঁচ মিনিট সক্রিয় থাকে, তার থেকে কিছু বেশি তিন ঘণ্টা পর্যন্ত এবং প্রচুর ভাইরাস লোড ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত। মৃতদেহে লেগে থাকা ও সক্রিয় থাকা সম্ভাব্য কিছু সংখ্যক ভাইরাসকে মাথায় রেখেই এই হাত ধোওয়া। কিন্তু একজন কলেরা রোগীর জামাকাপড় বা ঐ রোগে মৃত ব্যক্তির দেহ কয়েকদিন পরে ছুঁলেও যেমন বাধ্যতামূলকভাবে ভালভাবে হাত ধোয়া দরকার এ ক্ষেত্রে তা অনেকটাই কম। কারণ কলেরার জীবাণু কোভিডের বা অন্য ভাইরাসের মতো নয়, সেটি শর্তসাপেক্ষে বহুদিন থেকে যেতে পারে।

সবশেষে এটুকু বলা যায়, কোভিডের এই অতিমারি ও আতঙ্ক অন্য ধরনের নানা কুসংস্কারের সৃষ্টি তো করেইছে (যেমন করোনাদেবীর পুজো, করোনা-অসুরের যজ্ঞ, সূর্যগ্রহণের সময় করোনা ভাইরাসের সৃষ্টি, গো-মূত্র খেয়ে করোনা ভাইরাস মারার চেষ্টা, রামমন্দিরের শিলান্যাস হলে করোনার প্রকোপ কমবে জাতীয় প্রচার ইত্যাদি, তেমনি বিজ্ঞানের মুখোশে নানা ধরনের কুসংস্কারের বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে, যেমন কোভিডের রোগীকে এলাকা ছাড়া করা, বাইরে থেকে ফিরলেই জামাকাপড় চুল বারবার ধোয়া (অথচ বাইরে দু'চার ঘণ্টা রাখলেই জামাকাপড়ে হয়তো লেগে-থাকা ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হতে থাকে এবং মাথায় কেউ হাঁচি দিলে বা কাশি হলে নিষ্প্রাণ চুলেও সক্রিয় ভাইরাস থাকে না), কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তির জামাকাপড় সম্পূর্ণ আলাদা করা (অথচ সাবান দিলেই ঐ ভাইরাস নষ্ট হয়, তাই সবার কাপড়ের সঙ্গে তা কাচাই যায়, একটু বেশিক্ষণ রোদে বা খোলা জায়গায় রাখা)। এসবের একটি চরম চূড়ান্ত রূপ হল, মৃত্যুর পরেও কোভিড রোগীকে অব্যাহতি না দেওয়া। অথচ চারপাশের জীবিতরা নয়, ঐ মৃতদেহটি তার মধ্যে থাকা ভাইরাসকে 'না খাইয়ে' মারার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

উমা

অবহেলিত পরিযায়ী শ্রমিক

শ্রীময়ী ঘোষ

২৪ মে, ২০২০, কেন্দ্রীয় সরকার করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে গোটা দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করল। যে সব গরিব মানুষ রুজি-রোজগারের জন্য নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছিল, তারা কর্মহীন হয়ে পড়ল। সারা দেশ দেখল হঠাৎ করে লকডাউন ঘোষিত হওয়ায় কাতারে কাতারে পরিযায়ী শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, মাইলের পর মাইল হেঁটে, নিজেদের গ্রামে ফেরার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে। চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় বেশ কয়েকজনের প্রাণ গেল। একটাই প্রশ্ন ঘিরে তখন সারা দেশ তোলপাড়— এই বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকদের কেন এই দুরবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের কলকারখানায় কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল তা থেকে দুর্দশার দু-তিনটি কারণ এখানে তুলে ধরতে চাই। পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হল অবহেলা, শোষণ ও বঞ্চনা যা ভারতের অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে এক বৈষম্যমূলক শ্রম রাজনীতির কৃপায় সযত্নে লালিত-পালিত হয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লকডাউন তাদের বঞ্চনাপূর্ণ রোজনামচার এক ঝলক আমাদের সামনে হাজির করেছে মাত্র।

২০০৯-২০১৩-র প্রথমার্ধ— এই সময়কালে দুর্গাপুরে গবেষণার কারণে fieldwork-এর মাধ্যমে সেখানকার কলকারখানায় কর্মরত অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি। জানতে পারলাম, সেখানকার ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ সব ধরনের শিল্পক্ষেত্রেই অসংগঠিত শ্রমিক নিয়োগের জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা রয়েছে। মালিকপক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতি স্থির করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনায়, দুর্গাপুরের অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী দু-ভাগে বিভক্ত— 'ইউনিয়নের শ্রমিক' এবং 'মালিকের শ্রমিক'। বলাই বাহুল্য, ইউনিয়নের শ্রমিকরা যে

যেটির সদস্য তার মাধ্যমে নিযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ইউনিয়নগুলি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিজেদের শ্রমিক নিয়োগ করার 'quota' নির্ধারণ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কারখানার অস্থায়ী ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসেবে ইউনিয়নগুলি নিয়োগ করে থাকে। অন্যদিকে, মালিকের শ্রমিকরা হল পরিযায়ী শ্রমিক। মালিকদের বিশ্বস্ত শ্রমিক ঠিকাদাররা (যাদের অনেকেই একসময় শ্রমিক হিসেবে কাজ করত) নিজেদের গ্রামের বাসিন্দাদের পরিযায়ী শ্রমিকের কাজের জন্য নিয়ে আসে। দুর্গাপুরের অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিক আসে ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে। কিছু আসে ওড়িশা থেকে। গ্রামের অনুন্নত অর্থনীতি, দারিদ্র এদের বাধ্য করে জীবিকার তাগিদে এই শিল্পাঞ্চলে আসতে। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হয় কষ্টসাধ্য কাজের জন্য। মালিকদের মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেসব যন্ত্রচালিত ভারী কাজ থাকে, তার জন্য কায়িক পরিশ্রম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র অবাঙালি শ্রমিকদের আছে। অর্থাৎ, স্থানীয় ও বহিরাগত শ্রমিক বিভাজন বজায় রেখে এখানকার কলকারখানার অসংগঠিত কর্ম বণ্টন হয়ে থাকে। এই সমঝোতাসাপেক্ষ শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার ইউনিয়ন নেতাদের অভিযোগ হল, এই নিয়োগ পদ্ধতি লঙ্ঘন করার তীব্র প্রবণতা মালিকদের মধ্যে দেখা যায়। তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিবর্তে, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ করতে মূলত আগ্রহী। ফলে, স্থানীয় বাসিন্দারা কাজের সুযোগ হারাচ্ছে। ঝাড়খণ্ড ও বিহারের দারিদ্র-কবলিত অঞ্চলগুলি— যেমন, ঝাড়খণ্ডের দুমকা থেকে মালিকরা নিজেদের ঠিকাদারদের মাধ্যমে শ্রমিক আনিয়ে কাজে বহাল করছে। দরিদ্র এই মানুষগুলোকে অত্যন্ত কম মজুরির বিনিময়ে কাজ করানো হচ্ছে। অসহায় এইসব মানুষরা যদিও তা বোঝে, তা নিয়ে মুখ খোলে না। মালিক ও ঠিকাদারদের আঁতাতের ফলে এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা তটস্থ থাকে। দুর্গাপুরের শিল্পক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রম বাজার তাই ভীষণরকমের প্রতিযোগিতামূলক, যেখানে স্থানীয় ও বহিরাগত শ্রমিকরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে মালিক পক্ষের যুক্তি হল, ইউনিয়নের শ্রমিকদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা উৎপাদন ব্যস্থায় বিঘ্ন ঘটায়, মুনাফার ক্ষতি হয়। তারা কাজ না করলেও রাজনৈতিক চাপে তাদের পুরো মজুরি দিতে হয়। তাই মালিকদের অভিমত, ট্রেড ইউনিয়ন মদতপুষ্ট এই 'রাজনৈতিক বিপত্তি' এড়ানোর একমাত্র পথ হল বহিরাগত পরিযায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা। এইসব শ্রমিকরা ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় না। মালিকরা ইচ্ছেমতন এদের দিয়ে কাজ করাতে পারে। উপরন্তু, ইউনিয়নের শ্রমিকদের অসম্পূর্ণ কাজের বোঝা পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ইউনিয়নের শ্রমিকদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার খেসারত দিতে হয় পরিযায়ী শ্রমিকদের। এরা কাজ হারানোর ভয়ে মালিক ওবং শ্রমিক ঠিকাদারের সব শর্ত পূরণ করতে রাজি হয়। মালিকদের মুনাফার স্বার্থের সাথে ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক সক্রিয়তা তথা ক্ষমতার এই টানাপোড়েনের মধ্যে দুর্গাপুরের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার শর্ত ঠিক হয়। শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকারটুকুও তাদের জোটে না।

অসংগঠিত শ্রম বাজারের বৈষম্যমূলক চরিত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকার দ্বারা পরিপুষ্ট কারণ তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিসরে পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ট্রেড ইউনিয়নগুলি শুধুমাত্র স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তিত। স্থানীয় যারা ইউনিয়নের শ্রমিক, তাদের দাবিদাওয়া পূরণ করার জন্য ইউনিয়নগুলি তৎপর। এর প্রধান কারণ হল, স্থানীয় শ্রমিকরা ভোটার হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। অতএব, ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্থানীয় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার্থে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিপরীতে, অস্থানীয় পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজে আসে না। তাই ইউনিয়নগুলির কাছে এদের কোনো 'দাম' নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদার প্রশ্ন কোনোরকম রাজনৈতিক গুরুত্ব পায় না। অবহেলিত, বঞ্চিত অবস্থার মধ্যেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। এই বাস্তবের ভিত্তিতে একথা অনস্বীকার্য যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দুর্গাপুরের পরিযায়ী শ্রমিকদের দাবিদাওয়া শ্রমিক আঙিনায় স্বীকৃতি পায় না। এ থেকে বোঝা যায়, বৈষম্যমূলক এক শ্রম রাজনীতির বলয়ে ভিনদেশী শ্রমিকরা ঘুরপাক খায়। এই শ্রম রাজনীতির দায়ভার দুর্গাপুরের স্থানীয় প্রশাসন কিন্তু এড়াতে পারে না। নির্দিষ্ট করে বললে, দুর্গাপুরের ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তরও পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য দায়ী। সংশ্লিষ্ট এই দপ্তর দুর্গাপুরের সব শ্রমিকদের সব কল্যাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ। শ্রমিক স্বার্থে সব শ্রম আইন সঠিকভাবে কলকারখানার ওপর নজরদারি করা, আইন লঙ্ঘনকারী যথাযথ শাস্তিপ্রদান বা জরিমানা করা — এসবই ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তরের প্রধান কাজ।

কিন্তু বাস্তবে, এসব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদাসীনতা নজরে পড়ে, যা নিঃসন্দেহে এই শিল্পাঞ্চলের বৈষম্যমূলক শ্রম রাজনীতিকে কৌশলগত (strategic) সমর্থন জোগায়। এ প্রসঙ্গে আন্তঃ-রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক (কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগের শর্ত) আইন, ১৯৭৯ উপযুক্ত উদাহরণ হিসেবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আন্তঃ-রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইননুযায়ী, পরিযায়ী শ্রমিক নিয়োগ করার জন্য ডেপুটি লেবার কমিশনারের অধীনস্থ কর্তৃপক্ষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের কাছ থেকে কারখানার মালিকদের অনুমতি নিতে হবে। সেই সঙ্গে যে শ্রমিক ঠিকাদাররা পরিযায়ী শ্রমিকের জোগান দেবে, উৎস রাজ্য (origin state) থেকে অর্থাৎ যেখান থেকে শ্রমিকদের আনা হচ্ছে এবং গন্তব্য রাজ্য (destination state) অর্থাৎ যেখানে শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে, উভয় রাজ্য থেকেই তাদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত হতে হবে। গন্তব্য রাজ্যে কর্মরত সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম সেখানকার সংশ্লিষ্ট শ্রমদপ্তরে অবশ্যই নথিভুক্ত করতে হবে। এই আইন পরিযায়ী শ্রমিকদের কিছু ন্যূনতম অধিকার সুনিশ্চিত করে— যেমন, যাতায়াতের জন্য ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাসস্থানের ভাতা। কিন্তু আইন বহির্ভূত অন্য এক চিত্র দুর্গাপুরে বিরাজ করছে। ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তরে পরিযায়ী শ্রমিকদের সর্বমোট সংখ্যার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলাম, সেই হিসেব আইন মোতাবেক রাখা হয় না কেন? উত্তরে জানলাম, পরিযায়ী শ্রমিকরা যেখান থেকে আসছে, সেই উৎস রাজ্যের প্রশাসনের দায়িত্ব হল তাদের হিসেব রাখা। সে কাজ দুর্গাপুরের শ্রমদপ্তরের নয়। অতএব, এই শিল্পাঞ্চলে অসংগঠিত কাজের জন্য বহাল হওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা স্থানীয় প্রশাসনের অজানা। দুর্গাপুরের এই বাস্তব গোটা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার প্রমাণ লকডাউনের সময়ই আমরা পেয়েছি। দেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা যে কত, তার সঠিক তথ্য কেন্দ্রীয় বা কোনো রাজ্য সরকারের কাছেই নেই। শ্রমিক সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের অভাব ছাড়াও, আর একটি শ্রমিক-বিরোধী নেতিবাচক দিক এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসে। তা হল, সেখানকার শ্রমিক ঠিকাদারদের ওপর ডেপুটি লেবার কমিশনারের নিয়ন্ত্রণহীনতা। আন্তরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইনের তোয়াক্কা না করে ঠিকাদাররা যেমন পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করায় না, তেমনি নিজেরাও সংশ্লিষ্ট শ্রম দপ্তর থেকে লাইসেন্স নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। দুর্গাপুরের কলকারখানায় যেসব শ্রমিক ঠিকাদাররা পরিযায়ী শ্রমিকদের জোগান দেয়, মূলত তারা মালিকদের বিশ্বস্ত পরিচিত। এদের কোনো লাইসেন্স নেই। একটি কারখানায় গিয়ে জানতে পারি, সেখানকার প্রাক্তন এক শ্রমিক যাকে মালিক পরবর্তীকালে শ্রমিক তদারকির কাজে নিযুক্ত করেছে, ঝাড়খণ্ডের নিজের গ্রাম থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে আসে। মালিকপক্ষের বিশ্বাস, লাইসেন্স অনুমোদন প্রক্রিয়ার আইনি জটিলতা, শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের বাধ্যবাধকতার 'ঝামেলা' থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায় হল নিজেদের পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে শ্রমিক বহাল করা। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক নিয়োগের এই রীতির রমরমা সম্ভব হচ্ছে আন্তরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক-আইন কার্যকর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ স্থানীয় প্রশাসনের তরফে অনুপস্থিত। আইন থাকা সত্ত্বেও আইনকে যথাযথভাবে বলবৎ করে গরিব শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে সুরক্ষা প্রদান করার উদ্যোগ ও সদিচ্ছার অভাব একদিকে যেমন দুর্গাপুরের শ্রম দপ্তরের অকার্যকারিতা তুলে ধরে, অন্যদিকে বুঝিয়ে দেয়, এই প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক শ্রম রাজনীতিকে কৌশলগত প্রশ্রয় জুগিয়ে চলেছে।

দুর্গাপুরের এই বাস্তব চিত্র থেকে সুস্পষ্ট যে তাদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নটি মালিক থেকে শ্রমিক ঠিকাদার, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে প্রশাসন— কারোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য হয় না। অবহেলিত, শোষিত শ্রমিক সত্ত্বা নিয়ে এদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। তাই, ভারতে তাদের সঠিক সংখ্যা কত, সে তথ্য কারো কাছে নেই। মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক স্বার্থের সমঝোতার ফলে যে বৈষম্যমূলক শ্রম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় তথা প্রশাসনিক কৌশলগত সমর্থনের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত বলেই মনে হয়। এই অর্থে, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, পরিযায়ী শ্রমিকদের বঞ্চনা ও অবহেলা অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে মালিকপক্ষ-ট্রেড ইউনিয়ন-প্রশাসনের একপ্রকার আঁতাতের ফল। ভারতের শ্রম বাজারে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। তাদের অবহেলিত শোষিত শ্রমিক জীবন অদৃশ্য, অস্বীকৃতভাবে অতিবাহিত হতে থাকে। পরিযায়ী শ্রমিকরা বরাবরই 'মিসিং ওয়ার্কার্স', যাদের হদিশ রাখার তাগিদ কেউ বোধ করে না। তাদের জীবনের

এর পরের অংশ ৩০ পাতায়

পর্ব - ৫

বুকে ব্যথা — হার্টের ব্যথা কী?

গৌতম মিস্ত্রী

গুরুত্বপূর্ণ সাফাই (important disclaimer)

বুকে ব্যথা হলে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে সেটা হার্টের রোগের কারণও হতে পারে। তাই এমন রোগকষ্টের চিকিৎসা প্রশিক্ষিত পেশাধারীকেই করতে দিন। স্বচিকিৎসার এই পর্বটা কেবল বুকের ব্যথার শারীরিক কারণগুলোকে বুঝে নেওয়ার ও যথাসময়ে অর্থাৎ কখনও রয়েসয়ে বা কখনও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা কেন্দ্রের দ্বারস্থ হওয়া দরকার, সেটা বুঝে নেবার জন্য রচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাঝরাতে বুকের ব্যথা 'সরবিট্রেট' নামের বড়ি খেলে যদি ব্যথা নিমেষে নিরাময় হয়ে যায়, সেটা হৃদরোগের অস্তিত্বের আভাস দেয়। সে ক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে না পড়ে, কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যাওয়া উচিত। কারণ ওই 'সরবিট্রেট' নামের বড়ি কেবল কিছু হৃদরোগের ব্যথা কমাতে পারে, ভবিষ্যতের সুস্থতা নির্ভর করে অন্য মাত্রার চিকিৎসার উপরে— সেটা হাসপাতালেই সম্ভব। এই নিবন্ধটি বুকের ব্যথার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কষ্টের প্রথাগত চিকিৎসার বিকল্প নয়।

২০২১ সালের জুলাই মাসের এক দিনে, বর্ষার অস্বাভাবিক বারিধারা ও একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শহুরে সামাজিক অব্যবস্থায় অন্য অনেকের মতো আমিও সকালবেলায় অনুভব করলাম, আজ আমাকে একটা বাধ্যতামূলক অকর্মণ্য দিন বা বকলমে ছুটি ঘোষণা করতে হবে। আজ কলকাতা মহানগরীর জলনিকাশি ব্যবস্থা আমারই মতো অকর্মণ্য। বেচারা রুগীরাও হয়তো তাই-ই ভাবছেন।

ফোনের টুংটাং ধ্বনির সম্ভাবনায় কান খাড়া করে রাখলাম, জরুরি ফোনগুলো টয়লেটে থাকার সময়গুলোতেই বেশি করে আসে। ফোন এল তেমনি এক সময়। এমন কুসময়ে একজন মাঝবয়সী মানুষের ফোন— ওনার বুকে ব্যথা হচ্ছে। আজ ওনার ক্লিনিকে আসার কথা ছিল। সোমত্ত আমি যদিওবা ক্লিনিকে যেতে পারি, ওনার পক্ষে সেটাও অসম্ভব। উনি বললেন, ওনার পাড়ার রাস্তায় কোমর সমান জল— অ্যাম্বুলেন্সও ঢুকতে পারবে না। এখন কী করা? এই ধরনের সমস্যা সমাধানের কথা কোনও ডাক্তারি বইতে লেখা থাকে না, কোনও সেমিনারে আলোচনা হয় না, এমনকি সবজান্তা গুগলেও এই সমস্যার সদুত্তর নেই।

কেবল ফোনের কথোপকথনে বুকের ব্যথার সমস্যার নিরাময় সম্ভব না হলেও এমনতরো সমস্যার কিছু একটা কাজে লাগানোর মতো সমাধান পাওয়া যায় কিনা সেটা নিয়েই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

প্রশ্ন দুটো : ১) বুকের ব্যথা, দাঁতের বা হাঁটুর ব্যথার চেয়ে কেন আতঙ্কের? ২) বুকের ব্যথার কারণগুলো কী? কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে বুকের ব্যথা সহনশীল হলে আতঙ্কিত হব না। কর্পোরেট হাসপাতালের মুরগি হব না।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর সহজ। একটি বিদেশি সমীক্ষায় দেখা গেছে, বুকের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের দ্বারস্থ মানুষদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১.৫ শতাংশের বুকের ব্যথা হার্টের রোগের কারণে হয়। (Klinkman MS, Episode of care for chest pain: a preliminary report from MIRNET, Michigan Research network: J Fam Pract 1994: 38(4): 345)। আমাদের দেশে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব পশ্চিমের দেশগুলোর চেয়ে বেশ বেশি, তার উপরে আমরা অনেক বেশি সহনশীল (!)— রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের ঝুঁকি নেবার প্রবণতা বিদেশিদের থেকে বেশি, তার উপরে হাসপাতালের সম্ভাব্য খরচের বোঝা এড়ানোর জন্য প্রথমে আমরা টোটকা চিকিৎসা— অম্বলের বড়ি, গরম জল, এমনকি বাড়িতে থাকলে 'সরবিট্রেট' নামের হৃদরোগের অতি পরিচিত ট্যাবলেট ইত্যাদি চেষ্টা করে থাকি। তাই ধরে নেওয়াই যায় আমাদের দেশে হাসপাতালের ইমারজেন্সি রুমে বুকের ব্যথায় আক্রান্ত ১০০ জনের মধ্যে প্রাণসংশয়কারী হৃদরোগ বিদেশিদের থেকে একটু বেশি— ধরা যাক ৪ শতাংশ। বাকি ৯৬ জনের তখনই হাসপাতালের দিকে দৌড়নোর দরকার থাকে না। কিন্তু ১০০ জনের মধ্যে তিনি সেই চার জনের দলে পড়ছেন কিনা সেটা জানা জরুরি। বর্ষণ মুখরিত দিনে আমার কাজ সেই মানুষটি বিরল ৪ শতাংশের দলে পড়ছেন কিনা সেটা বুঝে নিয়ে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর একটু বিশদে বলা দরকার, কারণ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বুকের ব্যথার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। মানুষের বুকের খাঁচার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্গ সুরক্ষিত থাকে— হৃদপিণ্ড আর ফুসফুস। বিবর্তনের দৌলতে

প্রাপ্ত মানুষের বুকের খাঁচার মধ্যে বন্দি থাকে ইসোফেগাস বা খাদ্যনালী, পেটের মধ্যের অনুভূতি মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যাওয়া স্নায়ু ইত্যাদি। আর বুকের খাঁচার কথাটাই বা বাদ দিই কি করে। বুকের খাঁচার হাড় আর তরুণাস্থির অস্থিসন্ধিগুলো প্রায়শই প্রদাহে আক্রান্ত হয় (costochondritis)। সেটাও বুকের ব্যথার একটা বড় কারণ। ফুসফুসের বাইরের আবরণ স্বরূপ 'প্লুরা'-র প্রদাহে শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার সময় তীব্র ব্যথা হয় বুকে। আবার মানসিক অবসাদে এক ধরনের বুকের কষ্ট হয়, সেটাও অনেকে ব্যথা বলে প্রকাশ করেন।

বুকের ব্যথার কারণ বহু। বিনা আপোসের চিকিৎসায়, মানে হাসপাতালের ইমারজেন্সি রুমে, আউটডোরে অথবা ডাক্তারের চেম্বারে প্রথমে ডাক্তার কষ্টের বিবরণের বিশ্লেষণ আর শারীরিক পরীক্ষা করে নেন। তার পরে করেন প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ল্যাবরেটরির পরীক্ষা— ইসিজি, এক্সরে, ইকোকার্ডিওগ্রাম, ট্রপ-টি টেস্ট, করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, এন্ডোস্কোপি, আল্ট্রাসোনোগ্রাম ইত্যাদি। আমরা সেই জটিল আলোচনায় না গিয়ে তাৎক্ষণিক, আপৎকালীন সমাধানের কথা আলোচনা করি, যখন রোগী চিকিৎসকের কাছে বা চিকিৎসক রোগীর কাছে পৌঁছতে পারছেন না। হাজার হোক, পত্রিকার একটা নগণ্য নিবন্ধ বুকের ব্যথার মতো গুরুতর সমস্যার সমাধান চকিতে নিশ্চয়তার সাথে করে দেবে এ আশা কেবল পাগলেই করে। অসময়ে, যখন ডাক্তারের কাছে পৌঁছানোর উপায় কেবল দূরভাষ, সেই কথোপকথনের মাধ্যমে কতটুকু সমাধান হয় সেটাই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কোভিড-১৯-এর দৌলতে এমনতরো প্রচুর শারীরিক সমস্যার সমাধান অন-লাইন নামের এক নতুন চিকিৎসার অবতার মানুষকে দিশেহারা না-চিকিৎসার বদলে বিকল্প ও কিঞ্চিৎ আপোসের চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ও দিতে বাধ্য করেছে। শক্তিশালী ইন্টারনেট পরিষেবা ডাক্তার ও রোগীর কাছে থাকলে ভিডিও কন্সাল্টেশন না থাকলে কেবল মোবাইল ফোনের কথোপকথন নির্ভর চিকিৎসা পরিষেবা বিগত দুই বছর বেশ কিছু রোগাক্রান্ত মানুষকে ভরসা জুগিয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম সংখ্যার ও নিম্নমানের হলেও, 'নাকের বদলে নরুণ' পাওয়ার মতো, চিকিৎসা পরিষেবার এই নব-অবতারের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ভিডিও বা অডিও নির্ভর চিকিৎসায় রোগীকে সামনাসামনি দেখার, তাঁকে পরীক্ষা করার সুযোগ নেই। ভবিষ্যতের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবায় হয়তো বা ডাক্তার-রোগীর মোলাকাতের প্রয়োজন না-ও হতে পারে। হয়তো ডাক্তারেরও কাজ কোনও যন্ত্র-রোবট করে দেবে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আপোসের নয় এমন চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তার-রোগীর সাক্ষাৎ জরুরি। কোভিডের লকডাউন-পৃথিবী আমাদের এই প্রয়োজনটা ভালো করে বুঝিয়ে দিল।

এবার ফিরে যাই ফোনের অপর প্রান্তের মানুষটির বুকের ব্যথার সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায়। বুকের ব্যথা কোনও হার্টের রোগের কারণে কিনা সেইটাই বড় প্রশ্ন। কারণ তাহলে ব্যথায় আক্রান্ত মানুষটিকে সত্বর হাসপাতালের ইমারজেন্সি রুমে হাজির হতে হবে। আশার কথা, বুকের ব্যথা হৃদরোগের কারণে হলে, ব্যথার বিবরণ ভালো করে শুনে, সেই তথ্য বিশ্লেষণ করেই শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে সেটা বুঝে নেওয়া যায়। সেটা ফোনেই করে নেওয়াই যায়। যেটা অনেক ক্ষেত্রে যায় না, সেটা হল রোগীকে সামনাসামনি দেখে আর স্পর্শ না করে দূর থেকে ফোনে বা ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসকের দেওয়া চিকিৎসা-নিদান রুগীর কাছে ভরসাযোগ্য করে তোলা। ডাক্তার বা রুগী পরস্পরের কাছে অচেনা হলে সেই অবিশ্বাসের মাত্রা বেশ বেশি। যারা ভরসা করেন, তাদের জন্য পরের আলোচনা।

যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে বুকের ব্যথা হার্টের রোগ বলে চেনা যায়, সেগুলো এইরকম— ১) বুকের কোনও বিশেষ একটি বা একাধিক স্থানে ব্যথা হয় না। মনে হয় যেন বুকের ভিতরে অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে— কেউ যেন বুকের মাঝখানে তুরপুন দিয়ে ফুটো করে চলেছে। কোনও এক বা একাধিক সুস্পষ্ট স্থানে আঙুল দিয়ে ব্যথার সঠিক স্থানটা নির্দেশ করা যাচ্ছে না। যেন কেউ একটা দড়ি দিয়ে বুকটাকে বেড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে— শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আঙুল দিয়ে বুকের কোথাও চাপ দিলে ব্যথার কোনও তারতম্য হচ্ছে না। ২) সাথে সারা শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম হচ্ছে। ৩) নড়াচড়া করা যাচ্ছে না। নড়াচড়া করলেই ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে। চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাকলেই বরং কিছুটা আরাম হচ্ছে। ৪) এমন ব্যথা অনেক সময় একনাগাড়ে হয় না। শুয়ে-বসে থাকলে ব্যথা কমছে বটে, কিন্তু হাঁটাহাঁটি করলেই ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে। ৫) বিরল ক্ষেত্রে, যদি হার্টের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায়, তবে শুয়ে থাকলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় সঙ্গে শুকনো কাশি। উঠে বসলে শ্বাসকষ্ট কিছুটা কম হয়। ৬) মানুষটির বয়স, লিঙ্গ, আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও আগের থেকে রোগ থাকলে সেটা জেনে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। হৃদরোগ হওয়ার একটা নিম্নতম বয়স আছে। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে মানুষটির বয়স ৪০ বৎসরের কম হলে

অথবা মহিলা হলে হৃদরোগের সম্ভাবনা কম। যদিও কমবয়সী ও মহিলাদের হৃদরোগ হয় না এমনটা বলা যাবে না। আমরা কেবল সম্ভাবনার কথা আলোচনা করছি। ধূমপায়ীদের, উচ্চ রক্তচাপের ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হৃদরোগের সম্ভাবনা বেশি। ৭) অনেকক্ষণ ধরে, বা বেশ কয়েকদিন ধরে বুকে ব্যথা হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময়, জোরে হাঁটার সময়, স্নান করার সময় যে বুকের ব্যথা বাড়ছে না। বুকের বিশেষ স্থানে, আঙুল দিয়ে স্থানটা নির্দেশ করা যাচ্ছে, আঙুল দিয়ে চাপলে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে। 'চিনচিন' করে ব্যথা বা আলতো করে ব্লেড বা ছুরি দিয়ে অসাবধানে হাতের আঙুল কেটে গেলে যেমন ব্যথা হয় তেমন ব্যথা বুকে হলে সেটা হার্টের রোগের কারণে হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম।

আজকাল নিজেই ঘরে বসে মোবাইল ফোনে বিশেষ ইসিজি রেকর্ডার দিয়ে ইসিজি করে সেটা চিকিৎসককে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন। এইরকম ইসিজি রেকর্ডারের দাম ৫০০০-১৫০০০ টাকা। হার্ট অ্যাটাক, বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হল কিনা সেটা বোঝার জন্য ওষুধের দোকানে ৫০০ টাকায় কিনতে পাওয়া যায় 'ট্রপ টি' টেস্টের জন্য লাগে আঙুলে সুঁচ ফুটিয়ে বার করা এক ফোঁটা রক্ত। এই পরীক্ষাও ঘরে বসে করা যায়।

এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, মানব শরীর একটা জটিল যন্ত্র। শারীরিক সব ক্রিয়ার গাণিতিক সূত্র এখনও অধরা। তাই কোভিড-১৯ আক্রান্ত তরুণ রুগী হঠাৎ প্রাণ হারান। এমনটা অন্য রোগেও হয়। বিনা বুকের ব্যথায় অনেকের হার্ট অ্যাটাকও হয়। বুকের ব্যথার তীব্রতা নয়, তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে, যেটার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করলাম। আসলে মানুষের ব্যথা-কষ্ট সহ্য করার বৈশিষ্ট্যে প্রচুর ফারাক। এই রহস্য নিয়েই একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি জৈবিক কর্মকাণ্ডের গাণিতিক সূত্রের সন্ধানে রত। সেটা সেদিন আয়ত্তে আসবে, সেদিন ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না। যন্ত্র ডাক্তারের কাজ আরও দক্ষতার সঙ্গে করে দেবে। গ্রীক দার্শনিক 'প্লেটোর' বিতর্কিত 'এসেন্সিয়ালিজম' সেদিন আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

আপনার বয়স যদি ৪০ বৎসরের বেশি হয়, যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে, যদি মোটা হন, যদি নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চা না করেন, যদি উচ্চ রক্তচাপে বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে, তবে বুকের ব্যথা হৃদরোগের কারণে হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে সত্বর ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি বুঝবেন, আপনি ১) হৃদরোগে আক্রান্ত (হার্ট অ্যাটাক, myocardial infarction, acute coronary syndrome) হলেন, না ২) কেবল হৃদরোগের প্রাথমিক লক্ষণ (iscaemic heart disease) প্রকাশ পেল মাত্র।

প্রথম ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে দৌড়তে হবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরের দিন চিকিৎসা কেন্দ্র ও চিকিৎসক বাছাই করে নিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য গেলেই হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডের রক্তনালীতে কোলেস্টেরল, সক্রিয় অণুচক্রিকা, ফিরিন ইত্যাদি পদার্থ (atherosclerotic plaque) জমে রক্তনালী সরু (আংশিক ব্লক) হয়ে যাওয়ার জন্য রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। একদিন দেরি করার জন্য হৃদপেশির উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষতি হয় না। আবার প্রথম ক্ষেত্রে সরু হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডের রক্তনালীর ভিতরের গায়ে atherosclerotic plaque ফেটে যাওয়ার ফলে সেখানে রক্ত জমাট বেধে গিয়ে সেই রক্তনালীকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ (সম্পূর্ণ ব্লক) করে দেয়— রক্ত চলাচল ক্ষণিকের জন্য হলেও স্তব্ধ করে দেয়। ফলে সেই রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত সরবরাহে অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হৃদপিণ্ডের পেশির একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া রক্তনালী প্রাকৃতিকভাবে উন্মুক্ত না হলে (কালেভদ্রে সেটা হয়) অথবা চিকিৎসার দ্বারা ব্লক খোলা না গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হৃদপিণ্ডের একাংশ চিরতরে অকর্মণ্য হয়ে যায়— কোনও আধুনিক চিকিৎসার দ্বারাই সেই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ অসম্ভব। হৃদরোগে আক্রান্ত (হার্ট অ্যাটাক) ব্যক্তির তাই কালবিলম্ব না করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার সুবিধা আছে সেরকম হাসপাতালে পৌঁছানো দরকার। যেখানে কাছেপিঠে সেরকম চিকিৎসা পরিষেবা নেই, সেখানে বিকল্প চিকিৎসা হিসাবে হৃদপিণ্ডের রক্তনালীর মধ্যের রক্তের ডেলা ওষুধের দ্বারা গলিয়ে দেবার চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। ওই বিকল্প চিকিৎসার নাম থ্রম্বোলাইসিস বা ফিব্রিনোলাইসিস। এই চিকিৎসা যে কোনও সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে প্রয়োগ করা যায়, যদি উপযুক্ত চিকিৎসক সেখানে সেই সময় উপস্থিত থাকেন।

অসময়ে বুকে ব্যথা হলে চিকিৎসককে ফোন করার আগে জেনে নিন ডাক্তারকে কি কি বলতে হবে বাহুল্য বর্জন করে। বুকের ব্যথার কারণ নির্ণয়ে ডাক্তারের দরকার দশটি দিশা— ১) এরকম ব্যথা আগে কখনো হয়েছিল না প্রথম হল? একাধিকবার হলে সবচেয়ে তীব্র ব্যথার ঘটনাটিও বলতে হবে। ২) ব্যথা কখন শুরু হল, কতক্ষণ ধরে ছিল বা আছে? 'এই মরসুমে যেদিন খুব বৃষ্টি হল' বা 'যেদিন শ্রীলঙ্কা আর ভারতের

ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল' এইরকম অস্পষ্ট সময়কাল উল্লেখ না করে নিজে ক্যালেন্ডার দেখে যতটা সম্ভব সঠিক তারিখ উল্লেখ করুন। হয়তো সেই বেয়াড়া ডাক্তার তার মগজ আপনার ব্যথার কারণ নির্ণয়ে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করছেন— কোনোদিন বৃষ্টি হল খেয়াল নেই, হয়তো নিরস ক্রিকেটের খবর রাখেন না। এই তুচ্ছ দিনক্ষণ নির্ণয়ের বোঝা দিয়ে ডাক্তারের কাজ কঠিন করে দিলে ক্ষতি আপনারই। ৩) ব্যথা শুরুর ঠিক আগে আপনি কি করছিলেন— শুয়ে-বসে ছিলেন না কোনও কাজ করছিলেন? কি কাজ করছিলেন? ৪) ব্যথার স্থানটা কী আঙুল দিয়ে নির্দশ করতে পারছেন? না আবছাভাবে বুকের ভিতরে— প্রায় সমস্ত বুক জুড়েই ব্যথা হচ্ছে? ব্যথা কী কোনও হাত বা চোয়ালের দিকেই ছড়িয়ে পড়ছে? ৫) ব্যথার সঙ্গে আর কি কি কষ্ট হচ্ছে— যেমন শ্বাস কষ্ট, অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি। ৬) হাঁটাচলা করা আর শুয়ে থাকার সময়ে ব্যথার কোনও তারতম্য হচ্ছে কী? ৭) আপনি কি নিয়মিত কোনও ওষুধ খান? সেগুলোর নাম, পরিমাণ, দৈনিক ব্যবহারের তথ্য কাগজে লিখে রাখুন। ডাক্তার বিদগ্ধ হলে সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন। ৮) আপনার উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তের কোলেস্টেরল আছে কিনা সেটা জানা থাকলে সেই তথ্য ডাক্তারকে জানাতে হবে। সেই তথ্য মজুত রাখুন। ৯) যদি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, তবে তারিখ সহ রক্তের চাপ, নাড়ির গতি (পালস্ রেট), রক্তের সুগার, কোলেস্টেরলের মাত্রার তথ্য হাতের কাছে রাখুন। ১০) অপ্রয়োজনীয় তথ্য হিসাবে 'আমি বিকেলে দুটো আলুর চপ খেয়েছিলাম, ভেবেছি হয়তো গ্যাসের ব্যথা' ইত্যাদি উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আলুর চপ খাওয়ার কথা বলতে পারেন, কিন্তু সেটা বুকের ব্যথার কারণ হতে পারে আপনার এই অনুমান ডাক্তারকে প্রভাবিত করবে। সেটা না করলেই ভালো। আপনার কাজ অবিকৃত তথ্য পরিবেশন করা, ডাক্তারকে ক্লু দেওয়া বুদ্ধিমান রুগীর কাজ নয়। ওটা ডাক্তারের কাজ। তাঁকেই কারণ নির্ণয় করতে দিন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই তথ্য জেনে আপনাকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা সুপরামর্শ দিতে পারবেন। **উমা**

প্রয়াত তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৬-২০২১)

নভেম্বর ২০০৮, উৎস মানুষ প্রত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে প্রয়াত হন। আমাদের দিশেহারা অবস্থা। পত্রিকা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অশোককে শ্রদ্ধা জানানোর একটাই পথ খোলা, উৎস মানুষ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কে হাল ধরবে? পত্রিকা চালানো কি ছেলেখেলা? বিশেষ করে উৎস মানুষ-এর মতো পত্রিকা। এ তো আর পাঁচটা পত্রিকার মতো নয় যে লেখার অভাব হবে না। উৎস মানুষ পত্রিকা যেসব বিষয় নিয়ে চর্চা করে তার লেখক পাওয়াও বেশ কঠিন। সবচেয়ে বড় কথা আর্থিকভাবে বেশ দুর্বল পত্রিকার লেখা কম্পোজ করা, ট্রেসিং নেওয়া ও প্রেসে তা পৌঁছে দেওয়া এইসব প্রাথমিক কাজগুলোর পেশাদারি পরিশ্রম কম না। এরকম সব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা যখন ভাবছি, এগিয়ে এলেন অশোকের দাদা তপনদা। ওঁর পরিবারের এক সদস্য আগে থেকেই উৎস মানুষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ঘাড়েই দায়িত্ব চাপল। তাতে তপনদার সায় না থাকলে অশোক-পরবর্তী উৎস মানুষ বেরোত কিনা সন্দেহ। উৎস মানুষ পত্রিকার একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, চাইতেন পত্রিকা যেন বন্ধ না হয়। প্রতি বছর উৎস মানুষ আয়োজিত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতায় আসতেন। বক্তৃতা শেষে কিছু ক্রিটিকাল প্রশ্ন করতেন যা আর পাঁচজন শ্রোতার থেকে বেশ আলাদা। তপনদার প্রশ্ন ও বক্তার জবাবি নিয়ে স্মারক বক্তৃতা প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। উৎস মানুষে বোধহয় তাঁর একটি লেখাই বেরিয়েছিল। কিন্তু পত্রিকার লেখা পড়ে নিয়মিত মতামত দিতেন। অধ্যাপনা থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের সম্পাদনায় 'ফলা' প্রকাশ করেন। আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষ তপনদা বইয়ের জগতে বাস করতেন। বইমেলায় আমাদের স্টলে মাঝেমাঝেই আসতেন। আর তপনদা আসা মানেই কফি, ফিশ ফ্রাই নয়ত ফিশ রোল। উৎস মানুষ-এর অতি বিপদের দিনে মুষ্টিমেয় যে ক'জন পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি। — **উৎস মানুষ**

বাজার বনাম সরকার

শৈবাল কর

অর্থনীতির প্রাথমিক শিক্ষায় মুদ্রাস্ফীতি বনাম বেকারত্বের বিষয়টির বিশদ আলোচিত হয়। জাতীয় সমীক্ষার নিরিখে এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটি নেতিবাচক— অর্থাৎ একটি বাড়ল অন্যটি কম। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটতে থাকলে উৎপাদন বাড়ে এবং উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং উপাদানের চাহিদা বাড়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি। এর ফলে কাঁচামাল আগের তুলনায় দুষ্প্রাপ্য হয় এবং তার দাম বাড়ে। অন্যদিকে, উৎপাদিত দ্রব্যগুলি যেহেতু এই কাঁচামাল ব্যবহার করে, দাম বাড়ে সেগুলিরও। উৎপাদিত সম্পূর্ণ দ্রব্যের দাম বাড়লে দু-ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। প্রথমত, দাম বাড়লে যে চাহিদা কমে তা সবারই জানা। দ্বিতীয়ত, দাম বাড়লে কিন্তু যোগানও বাড়ে। এই দুই পরস্পরবিরোধী সম্পর্কের অভিঘাত মোট উৎপাদন বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। যদি দ্রব্যগুলি প্রয়োজনীয় বা অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে বিবেচিত হয়, তবে দাম বাড়লেও চাহিদা কম হয় না। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন বাড়লে উপাদানের ব্যবহার বাড়ে এবং এর ফলে অসংখ্য কর্মসংস্থানও ঘটে থাকে। কর্মসংস্থানের ফলে সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া দ্রব্যের চাহিদা আরও বাড়ে এবং এর ফলেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মসংস্থান বাড়লে বেকারত্ব যেমন কম, তেমনি মুদ্রাস্ফীতিও বাড়তে থাকে।

যদি দ্রব্যগুলি প্রয়োজনীয় বা অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে বিবেচিত হয়, তবে দাম বাড়লেও চাহিদা কম হয় না। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন বাড়লে উপাদানের ব্যবহার বাড়ে এবং এর ফলে অসংখ্য কর্মসংস্থানও ঘটে থাকে।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক পলিসি গ্রহণ করে থাকে। এই বিষয়েই সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাজার ব্যবস্থার সংঘাত ঘটে। ধরা যাক মুদ্রাস্ফীতি কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়ানোর পলিসি গ্রহণ করল। সুদের হার বাড়ানোর অর্থ হল যে দেশের ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও জমা এবং ধার এই দুই ক্ষেত্রেই সুদের হার বাড়াবে। এর ফলে জমা বাড়বে কিন্তু ধার নেওয়ার প্রবণতা কমবে। সুতরাং, মানুষের হাতে খরচ করার মতো অর্থের যোগান ঘাটতি হবে এবং মুদ্রাস্ফীতি কমবে। এর কারণ, মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম নির্ধারক হল উৎপাদিত দ্রব্যের যোগানের তুলনায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অধিক হয়ে যাওয়া। টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকলে, বাজার থেকে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা চলে যায়, এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বোঝাই যায় যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটি তেমন আশাব্যঞ্জক বা সুখবর নয়। বাড়ি ব্যবসার কথাই ধরা যাক না। লোনের উপর সুদের হার বাড়লে বাড়ি-ফ্ল্যাট কেনার প্রবণতা কমবে এবং এমনও হতে পারে যে, যাঁরা আগের রেটে ধার নিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে ঋণ শোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। সত্যি কথা বলতে কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে বাড়ি-জমির বাজারে ধস নামা। এইরকম বহু বিষয়ের ক্ষেত্রেই সরকারি পলিসি এবং বাজার ব্যবস্থার সম্পর্কে যথেষ্ট নেতিবাচক। এ সত্ত্বেও, সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতীত অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সামগ্রিক পট পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাহলে কি দেশের অর্থনৈতিক পলিসিগুলো আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলেছে, যেখানে সরকারি অঙ্গুলিহেলন ব্যতীত কোনো কিছুই হতে পারত না?

গভীর বিশ্বায়নের যুগে তা বোধহয় আর সম্ভব নয়। দেশের বাজারে খুব হস্তক্ষেপ ঘটলে লগ্নি বিদেশে পাড়ি জমাতে দ্বিধা করবে না। বিশেষত, লগ্নিকারিদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা সর্বাধিক। লগ্নি কমে গেলে যে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক উন্নয়ন সবই ধাক্কা খায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই সামগ্রিক চিত্র হিসেবে যা আলোচিত হল তা কিন্তু বিভিন্ন ছোট ছোট অর্থনৈতিক ঘটনার সমাবেশ। প্রথম, মুদ্রাস্ফীতির কথায় আসি। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আবহাওয়া-নির্ভর। গত বছর অনাবৃষ্টির ফলে খরা এবং চলতি বছর অতি বৃষ্টির ফলে বন্যার কারণে কৃষিতে ক্ষতির পরিমাণ মাত্রাছাড়া আকার ধারণ করেছে। এমনিতেই উৎপাদন কম থাকার দরুণ যে মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তিন বছর আগে, তার থেকে রেহাই মিলছে না কোনোভাবেই। মনে রাখতে হবে যে, কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যেও দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে একটি

সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। কৃষিজাত উৎপাদনের দাম বাড়লে, শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়ে কারণ একই পরিমাণে চাল-গম-সব্জি কিনতে গেলে আগের তুলনায় বেশি শিল্পজাত দ্রব্য বিনিময় করতে হয়। এছাড়া, খনিজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়ে কারণ কয়লা বা লোহা আহরণের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি হলে ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি হতে বাধ্য।

এই সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত হওয়ার সত্ত্বেও কৃষি পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার বিশেষ কিছু করতে পারে নি। অধ্যাপক কৌশিক বসু যখন ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ২০১০ সালে, তার কিছু দিন আগে থেকেই খাদ্য দ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের চিন্তার কারণ হয়েছে। গত বিশ বছর যাবৎ ভারতের অর্থনীতি কৃষি থেকে সেবায় প্রবর্তিত হয়েছে। যদিও কৃষিতে এখনও ৬০ শতাংশ মানুষ যুক্ত কৃষির উৎপাদন জাতীয় আয়ের নিরিখে কম দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশ। তবে বিদেশের উপর খাদ্য দ্রব্যের জন্য নির্ভরতা কমছে লক্ষণীয়ভাবে। এর সঙ্গে যদি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম রাখা যায়, তাহলে এ দেশের অর্থনীতি জাতীয় উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হতে পারে। সমস্যা হল, এই লক্ষে পৌঁছানোর আগেই কেন্দ্রীয় সরকার আরও কিছু ক্ষতিকর পলিসি শুরু করেছে দেশজুড়ে। আমার মনে হয়, এই পলিসিগুলো পরীক্ষামূলক স্তরে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আগেই দেশব্যাপী ব্যবহার শুরু করার মধ্যে অর্থনৈতিক বিবেচনা বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। রাজনৈতিক কারণ সরকার এই ধরনের পলিসি অবশ্য প্রায়ই নিয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'আলু অধিগ্রহণ'ও একটি ক্ষুদ্র পলিসি। রাজনৈতিক পলিসির মধ্যে যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, তা যদি অর্থনৈতিক যুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মানুষের মঙ্গল সত্যিই হয় কি? এ বিষয়ে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য অনায়াসে পড়ে নেওয়া যেতে পারে। যে রাজ্যে কৃষিজাত উৎপাদন সংরক্ষণ করার মতন পরিকাঠামো কিছুতেই তৈরি করা যায় না, হিমঘরের অভাবে আনারস, তরমুজ থেকে কমলালেবু সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী এবং মরসুমের পর অমিল, সেখান দাম নিয়ন্ত্রণ করে ফল পাওয়া যায় কি? যে বছর আলুর বাম্পার উৎপাদন হয়, সে বছর বহু টন আলু পচে নষ্ট হয় বা কৃষকের ক্ষতিসাধন করে অত্যন্ত কম দামে বিক্রি হয় বাজারে। এ দেশে কৃষি পণ্য সরাসরি বাজারে আসে না, বহু মধ্যস্থতাকারীর হাত ঘুরে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে আসে এবং বেশি দামে বিক্রি হয়। ফলে যখন আলুর দাম কমে যায়, কৃষক হয়তো কোনো দামই পান না, বরং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলেও মুনাফা করেন। উল্টোদিকে, যখন দাম বাড়ে, কৃষক পূর্বনির্ধারিত দরেই দাম পান এবং বেশি দামের সুফল পান মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা। ধান কিংবা আলুর ব্যবসায় স্থিরতা আনতে গেলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা সংখ্যা কমিয়ে কৃষকদের সঙ্গে বাজারের সরাসরি যোগাযোগ ঘটনোর বন্দোবস্ত করা খুবই প্রয়োজনীয়।

এই সমন্বয়ের অভাব উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া দাম নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ বাজার থেকে আলু অদৃশ্য হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক প্রবণতা। এর কারণ, যারা বাজারে আলু নিয়ে আসছেন তাদের মজুত করার ব্যবস্থাও রয়েছে। দাম নিয়ন্ত্রণ করা হলেই এরা আলু ধরে রাখবেন এবং সুবিধামতো কালোবাজারে বিক্রি করবেন। ভারতে কালোবাজারি ঠেকানোর রাস্তা খুব পরিস্কার নয়। আইন থাকলেও তা আরোপ করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং তথ্যের অপূর্ণতা এবং অসামঞ্জস্য দিয়ে ঘেরা। কৃষিপণ্যের বাজারে অসংগঠিত হওয়ার দরুন তথ্যের সমতা এবং যোগান অত্যন্ত কম। ফলে একবার গুদামজাত হয়ে পড়লে পুলিশ-প্রশাসন এবং সামাজিক গা-জোয়ারি ব্যতীত তা বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব। অর্থনীতির প্রাথমিক কিছু শর্ত এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী হয়ে পড়ে প্রায়শই।

সরকার যে বিষয়টিকে নিজেদের আয়ত্বে আনতে পারত সঠিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেটি হল উৎপাদনের মজুত ভাণ্ডার। সে ক্ষেত্রে, সারা বছর ধরেই হয়তো একই দামে বিক্রি করা যেতে পারে আলু, অন্য সবজি আর মরসুমি ফল। বড় রিটেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হলেও পূর্বনির্ধারিত দামে আলু উৎপাদন করা যায় এবং দামের উত্থান-পতনও ঠেকানো যায় অনেকটা। বড় রিটেল ব্যবসার সঙ্গে কম্পিটিশিনে অকৃতকার্য হলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা, যারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নন কিন্তু শুধুমাত্র কৃষক ও বাজারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে অনেক বেশি মুনাফা রোজগার করেন, তারাও অতিরিক্ত দামে কালোবাজারি করতে পারেন না।

সরকারের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লক্ষের উপরেও এই সম্ভাবনাগুলোকে খতিয়ে দেখা আশু প্রয়োজন বলেই মনে করেন বহু অর্থনীতিবিদ।

উমা

প্যারেন্টিং

অরুণালোক ভট্টাচার্য

এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই
নামতা পড়ে ছেলেরা সব পাঠশালার ওই ঘরে
নন্দী বাড়ির আটচালাতে কুমোর ঠাকুর গড়ে
মন বসে কি আর!

সনৎ সিংহের গাওয়া এই গানটি প্রত্যেক পুজোর আগে রেডিওতে খুব শোনা যায়। যেন বাড়ির লোকজন জোর করে বাড়ির ছোটটিকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুর্গাঠাকুর সেজে উঠেছেন। ছেলেদের স্বাভাবিকভাবেই পড়ায় মন বসছে না। সেই পাঠশালা এখন আর নেই। নেই যৌথ পরিবারের অভিভাবকদের সেই যৌথ শাসনও। রয়ে গেছে শুধু কৈশোরের চিরনবীন, উচাটন মন আর দুর্গাপুজোর উৎসব। উপরের গানটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩-তে। লক্ষ্য করবেন, কৈশোর মন মুক্তি চাইলেও তাতে কিন্তু মোটেই সায় নেই পাঠশালার পণ্ডিতমশাই বা বাড়ির অভিভাবকদের। অতএব লেখাপড়ার অনিচ্ছার কারাগার।

একটু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক। এই যে অভিভাবকত্ব বা প্যারেন্টিং-এরও একটি বিবর্তনের ইতিহাস আছে। আদিতে এই প্যারেন্টিং ছিল প্রাপ্তবয়স্ক-কেন্দ্রিক। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে, শৈশবকাল বলতে বোঝানো হত ৬ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপরেই ছোটদের পূর্ণবয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসাবে গণ্য করা হত। রেনেসাঁ যুগে (আ. চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী) শিশুদের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে— বড়দের পোশাক পরানো ছিল একটা ফ্যাশন। শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের, বড়দের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবেই মনে করা হত। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেই সময়ে শৈশবকালের কোনওরকম ধারণা সেই সময়ে ছিলই না। পুরো সমাজটাই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক কেন্দ্রিক।

আমেরিকা দিয়ে শুরু করা যাক। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে আমেরিকার কলোনিয়াল সময়কালে (আ. ১৫০০-১৭০০ খ্রি.) প্রাপ্তবয়স্করা অবশ্য মনে করতেন যে, শিশুদের মনন বলে একটা বস্তু আছে। পিউরিটান সম্প্রদায়ের অভিভাবকরা নরম শিশুদের বেছে নিতেন। তাদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে ধর্মযাজক করে তোলার দিকে সবিশেষ নজর দেওয়া হত। যদিও তখন প্যারেন্টিং ব্যাপারটা অভিভাবক বা প্রাপ্তবয়স্ক বা সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের ইচ্ছা এবং মস্তিষ্কপ্রসূত। শিশুমনকে পৃথক সত্তা মনে করলেও সেই সত্তাকে লালন করার মতো মানসিকতা তখনও গড়ে ওঠে নি। প্যারেন্টিং ব্যাপারটি তখনও একমুখী, যার অভিমুখ বয়স্কদের থেকে শিশুদের দিকে। যেটাকে আমরা কর্তৃত্ববাদ বলতেই পারি।

মনোবিদরা অনুধাবন করলেন, শিশুদের মন-জমিনটা একেবারেই অকর্ষিত এক ক্ষেত্র। সেখানে বীজ বপন করার ওপরে অনেকটাই নির্ভর করবে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন-ফসল। এই প্রথম প্যারেন্টিং-এর ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদ থেকে পরিবেশবাদের ভূমিকা অনুভূত হল। শিশুদের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক প্যারেন্টিং-এর জায়গায় মাতৃকেন্দ্রিক অভিভাবকত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম দিকে এই ধরনের ভাবনায় পরিবর্তন এল। এই সময়টা আসলে শিল্প বিপ্লবের গোড়ার দিক। শিল্প বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোলিউশনের সময়, বাড়ির কর্তা বা পিতৃস্থানীয় মানুষজন কর্মসূত্রে প্রায়শই বাড়ির বাইরে, দূরে কোথাও দিনের পর দিন কাটাতেন। ফলে শিশুরা বাড়ির বয়স্ক পুরুষমানুষদের পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের বন্ধন থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত হত। মায়ের সঙ্গে থাকা এবং তাঁর সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান ঘটিয়ে শিশুরা এক অন্যতর অভিভাবকত্বের সন্ধান পেতে শুরু করল। মনোবিদরা অনুধাবন করলেন, শিশুদের মন-জমিনটা একেবারেই অকর্ষিত এক ক্ষেত্র। সেখানে বীজ বপন করার ওপরে অনেকটাই নির্ভর করবে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন-ফসল। এই প্রথম প্যারেন্টিং-এর ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদ থেকে পরিবেশবাদের ভূমিকা অনুভূত হল। শিশুদের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক প্যারেন্টিং-এর জায়গায় মাতৃকেন্দ্রিক অভিভাবকত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করল। শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধির যে ধারণা, তারও সূত্রপাত এই সময় থেকেই। শৈশবকালকে বিভক্ত করা হল আদি মধ্য এবং শেষ পর্বে। শৈশবের বয়সভিত্তিক মানসিক বিকাশের পর্যায়ক্রমের

বিন্যাসের এই ধারণা মূলত ইউরোপ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। শৈশবের শিক্ষার বীজ বপন করাই যে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার মূল উপাদান, সেটা বুঝতেই মানুষের কেটে গেল প্রায় দু হাজার বছর।

আপাতদৃষ্টিতে শিশুদের মনন নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে একটা বোধোদয় ঘটলেও, অন্যদিকে এর ফলে প্যারেন্টিং নিয়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন সময়ের মনোবিদদের মধ্যে বিভাজন দেখা দিল। একদল মনে করতে শুরু করলেন, শিশুদের মানসিকতা বুঝে, তাদের মনের চাহিদা মিটিয়ে, তাদের বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত (ফ্রয়েড, বেঞ্জামিন স্পক ইত্যাদি)। আরেক দল মনে করলেন যে না— শিশুদের এতটা স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক হবে না। শিশুমনের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে সঠিক দিশা দেখানোর প্রাথমিক দায়ত্বটা বাড়ির বড়দের হাতেই থাকা উচিত (ওয়াটসন ইত্যাদি)। প্যারেন্টিং-এর ভাবনার পেন্ডুলামটি এই দুই ধারণার মধ্যে ক্রমাগত দোদুল্যমান ছিল।

এখনকার যুগে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। অভিভাবকত্বের ব্যাপারটি এখন অনেক নমনীয়। মনোবিদরা এখন এটিকে কোনও এক নির্দিষ্ট ধাঁচে না ফেলে— 'যখন যেরকম, তখন সেরকম' নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয় বলে মনে করছেন। সব শিশুর মনের চারিত্রিক গঠন এক নয়। সুতরাং তার জন্য কখনই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং কিছু নির্দেশিকা মেনে, প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়াটা অনেক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার।

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যর প্যারেন্টিং-এর শৈলীর একটা ফারাক আছে। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে প্যারেন্টিং-এর প্রকারভেদ নিয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ ডায়না ব্লুমবার্গ বাউমরিন ১৯৬০ সালে প্রথম লক্ষ্য করেন, শিশুদের আচার-ব্যবহারের তারতম্য তাদের প্যারেন্টিংয়ের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তিনি বুঝেছিলেন, একটি শিশুর মানসিক গড়ন এবং তার পূর্ণবয়সের মনন গড়ে তুলতে অনেকটাই সাহায্য করে প্যারেন্টিংয়ের এই শৈলী। তাঁর এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে তিনি প্যারেন্টিংকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমত অথরিটেটিভ প্যারেন্টিং বা নির্ভরযোগ্য অভিভাবকত্ব। দ্বিতীয়ত অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিং বা কর্তৃত্ববাদ অভিভাবকত্ব। তৃতীয়ত পারমিসিভ প্যারেন্টিং বা অনুমত অভিভাবকত্ব। ১৯৮০ সালে ম্যাকোবি এবং মার্টিন অভিভাবকত্বের এই বিভাজনকে আরও প্রসারিত করেন। তাঁরা শেষ ভাগ অর্থাৎ পারমিসিভ প্যারেন্টিংকে আরও দুটি উপবিভাগে ভাগ করেন, একটি থাকল অনুমত এবং অপরটি অনবহিত অভিভাবকত্ব বা নেগ্লেক্টফুল প্যারেন্টিং।

এবারে প্রত্যেকটি প্যারেন্টিং শৈলীর বিষয়ে দু-চার কথা। অথরিটেটিভ প্যারেন্টিংয়ে অভিভাবকরা চেষ্টা করেন, শিশুদের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তোলার। সেখানে কিছু নিয়মের বাঁধন থাকে ঠিকই, কিন্তু শিশুদের সেই নিয়মের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়। প্রয়োজন মতো শিশুদের মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই শৈলীর অভিবাবকত্বে শিশুরা অধীত বিদ্যায় পারদর্শী হয়, তাদের মানসিক সমস্যা কম হয়, এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেশি হয়। অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিংয়ে কিন্তু পুরোটাই কর্তৃত্ববাদ। এর বিশেষত্ব হল, অভিভাবকরা শিশুদের নিয়মের কঠিন বেড়াজালে বেঁধে ফেলতে চান। তাঁরা আশা করেন, তাঁদের সন্তানসন্ততি কঠিন নিয়মের মধ্যে দিয়ে বড় হলে জীবনে নিয়মানুবর্তিতা শিখবে এবং অনেক উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে এইসব শিশুদের মধ্যে মানসিক সমস্যা এবং অপরাধপ্রবণতা খুব বেশি। এরা লেখাপড়াতেও সাধারণত খুব ভালো কিছু করে উঠতে পারে না। পারমিসিভ প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিভাবকরা কোনোরকম নিয়মের ধার না ধেরে শিশুদের যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। কোনোরকম শাসনের মধ্যে না গিয়ে তাঁরা শিশুদের নিজেদের মতো করে বড় হতে উৎসাহ যোগান। এইসব শিশুরা সাধারণত আত্মকেন্দ্রিক ও আবেগপ্রবণ হয়। সম্পর্ক স্থাপন এবং সেই সম্পর্ককে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এরা খুব একটা পটু হয় না। নেগ্লেক্টফুল বা অনবহিত অভিভাবকত্বে শিশুরা একেবারে অবহেলিত। অভিভাবকরা তাঁদের শিশুদের প্রতি চরম উদাসীন এবং শীতল মনোভাবাপন্ন। তাদের জীবনযাত্রায় নিয়মকানুনের কোনও বালাই থাকে না। এই শিশুরা সামাজিকভাবে খুব গ্রহণযোগ্য হয় না। আবেগপ্রবণতা, মাদকাসক্তি এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম এই সব শিশুদের ক্ষেত্রে খুব বিপজ্জনক আকার নেয়।

এবারে আলোচনা করা যাক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভিভাবকত্বের শৈলীর ফারাক নিয়ে। প্রথাগতভাবে প্রাচ্যের মানুষেরা অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিং-এর ধারণায় বিশ্বাসী। অপরদিকে প্রাচ্যের অভিভাবকরা কিছুটা হলেও অথরিটেটিভ বা পারমিসিভ প্যারেন্টিং করতে ভালবাসেন। ভারতবর্ষের অভিভাবকদের কথা বলতে গিয়ে একটি অদ্ভুত বিশেষণের কথা মনে আসছে। সেটি হল 'টাইগার প্যারেন্টিং'— যার

বাংলা করলে দাঁড়ায় 'বাঘা অভিভাবকত্ব'। অ্যামি চুয়া নামক এক আমেরিকান উকিল Battle Hymn of the Tiger Mother নামে ২০১১ সালে একটি বই লেখেন। সেইখানেই তিনি এমন এক অভিভাবকত্বের কথা বলেছেন, যাঁরা শিশুদের অধীত বিদ্যার উৎকর্ষলাভে, তাদের ঘাম-রক্ত-অশ্রু ঝরানোতেও পিছপা হন না। তখন থেকেই প্যারেন্টিং-এর কাঠিন্য বোঝাতে এই বিশেষণটি বহুল ব্যবহৃত। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে টাইগার প্যারেন্টিং বা বাঘা অভিভাবকত্বের প্রবণতা খুব বেশি। টাইগার প্যারেন্টিং যে ভারতবর্ষে কতটা শিকড় গেড়ে রয়েছে, তার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল রাজস্থানের কোচিং-শহর কোটা শহর। সেখানকার আর্থিক লেনদেনের বহর শুনলে চোখ কপালে উঠতে পারে। এই শহরে বছরে ৭৫০০০ কোটি টাকার লেনদেন হয় শুধু ছাত্রদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নকে সাকার করতে। 'বাঘা' আর কাকে বলে? সনৎ সিংহর 'এক এক্কে এক' বা অধুনা অঞ্জন দত্তর 'ক্যালসিয়াম' গানে কিন্তু শুধুই শিশুদের অসহায়তার প্রতিধ্বনি। এ দেশে বেশিরভাগ বাবা-মায়েরাই চান, তাঁদের সন্তান লেখাপড়ায় উৎকর্ষতা দেখিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু সব শিশু যে একই ধাঁচে গড়া নয় বা সব শিশুর মনকে যে একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা যায় না, সেই বোধ কিন্তু ভারতীয় অভিভাবকদের মধ্যে খুব সীমিত। আবার উচ্চবিত্ত ভারতীয় অভিভাবকদের সন্তানরা পশ্চিমি প্রভাবে বেশিমাত্রায় পারমিসিভ প্যারেন্টিং-এর শিকার হয়ে জেল খেটেছে এরকম ঘটনাও কিন্তু আমরা দেখেছি। সে মাদক ব্যবহার বা বেআইনি অস্ত্র সংরক্ষণ বা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন— যে কারণেই হোক না কেন।

অভিভাবকত্বর স্টাইল বা শৈলী, অনেকটাই তার সংস্কৃতি এবং ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় চীনাদের অভিভাবকত্বের ধরণ, কনফুসিয়াসের দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শনের মূল কথা হল, গুরুজনদের প্রতি সম্মান। যেখান থেকেই হয়তো শুরু হয় বাবা-মার প্রতি ভক্তি, সংযত আবেগ এবং লেখাপড়ায় অখণ্ড মনোযোগ। অতএব চীনা অভিভাবকরা যে দর্শনের ভিত্তিতে ছেলেপিলে মানুষ করেন তা হল— chiao sun (প্রশিক্ষণ প্রদান) এবং guan (যুগপৎ শাসন এবং ভালোবাসা)। অনুরূপে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুকূল কেন্দ্রিক। সেখানকার দর্শনের সারমর্মও ছিল— তিতিক্ষা, ভক্তি এবং শিক্ষা। প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে পারিবারিক বন্ধন এবং সামাজিক সৌহার্দ্যবোধের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। সত্তরের দশক পর্যন্তও ভারতবর্ষে বৃহত্তর পরিবারের সদস্যরা--- এমনকি প্রতিবেশীরাও প্যারেন্টিং বা অভিভাবকত্বে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। তখন অবশ্য যৌথ পরিবারের রমরমা। বাবা-মা কেন্দ্রিক অনু পরিবারের বিভাজন তখনও শুরু হয়ে যায় নি। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে পরিবার বহির্ভূত মানুষজনের কিন্তু এই প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটাকে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া হয়। আজও কিন্তু গ্রাম-ভারতবর্ষে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানসন্ততিদের মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক ভরণপোষণের ভার প্রায় সারাজীবনই বহন করে থাকেন। সেটা ভালো না মন্দ, সেই বিতর্কের বোধহয় সমাধান করা মুশকিল।

যুগ পাল্টাচ্ছে। ডিজিটাল মাধ্যমের হাত ধরে, সমাজ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। পরিবারতন্ত্রের প্রথাগত ধারণাও ভেঙেচুরে যাচ্ছে। প্যারেন্টিংয়ের প্রথাগত সংজ্ঞার যে কঠিন বেড়াজাল, তা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। এশিয়া, আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকায় শিল্পের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে চলেছে। প্রাচ্যের অভিভাবকরা সুপ্রাচীন অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিংয়ের কর্তৃত্ববাদ থেকে বেরিয়ে এসে অথরিটেটিভ প্যারেন্টিংয়ের নমনীয়তার দিকে ঝুঁকছেন। আবার প্রাচ্যের অভিভাবকরা প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার রাশ কিছুটা হলেও শক্ত হাতে বাঁধতে চাইছেন। ব্যক্তিগত প্যারেন্টিংয়ের মূল সমস্যা হল যে, অভিভাবকত্বের সফলতা বুঝতেই অনেক দেরি হয়ে যায়। তখন আর নিজেকে শুধরে নেওয়ার উপায় থাকে না। কারণ সন্তানরাই তখন প্রাপ্তবয়স্ক। পরিবর্তিত প্যারেন্টিং শৈলীতে শিশুরা কতটা দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে বা তাদের দ্বারা দুনিয়ার কত উন্নতি হবে সেটা বোধহয় বলতে পারবে এক এবং একমাত্র ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র :

১। Eastern vs. Western parenting - Aruna Raghuram

২। Parenting Styles Then and now - Amita Roy Shah

৩। The Evolving Parent : Outline of the Evolution of Parenting Style - Elizabeth Rodriquez.

উমা

মঘা

সৌমেন মুখার্জি

মঘা একটা তারার নাম। বেশ উজ্জ্বল তারা। পৃথিবীর আকাশে উজ্জ্বল তারাদের মধ্যে একুশ নম্বরে পড়ে। কিন্তু এত তারা থাকতে মঘা কেন? বলব। তার আগে দেখে নেওয়া যাক মঘাকে নিজের চোখে দেখতে হলে আকাশের ঠিক কোথায় খুঁজতে হবে।

আসলে ঘড়ি ধরে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা তারাকে রোজ রোজ আকাশের একই দিকে দেখা যাবে না। কারণ আকাশটা সমানে পুব থেকে পশ্চিমে ঘুরে যাচ্ছে। ভুল বললাম। আসলে পৃথিবী নিজের অক্ষের (axis) চারদিকে রোজ প্রায় এক পাক করে ঘুরছে। অক্ষটা কি ব্যাপার? ধরুন একটা গোলগাল আলুর মাঝখান দিয়ে একটা কাঠি ফুঁড়ে কাঠিটা ধরে ঘোরালে আলুটাও কাঠির চারধারে ঘুরতে থাকবে। তখন কাঠিটা আলুর ঘোরার অক্ষ। এবারে কাঠিটা বাদ দিয়ে আলুটা যদি একইভাবে ঘুরতে পারে তাহলে আলুর অক্ষটা ওই বরাবরই থাকবে। পৃথিবীরও তাই অবস্থা। নিজের অক্ষের ওপর পশ্চিম থেকে পুব দিকে রোজ প্রায় এক পাক করে ঘুরছে। তাহলে আমরাও পৃথিবীর সঙ্গে পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরছি। তাই আমাদের মনে হচ্ছে আকাশটা পুব থেকে পশ্চিমে ঘুরছে।

আকাশের ঘোরা

এই জন্যেই যে কারণে সূর্যকে আমরা আকাশে পুব থেকে পশ্চিমে সরতে দেখি, তারাগুলোও একই কারণে পুব থেকে পশ্চিমে সরতে থাকে। তার মানে গোটা আকাশটাই প্রায় ২৪ ঘণ্টায় এক পাক করে ঘুরে চলেছে। দু-এক ঘণ্টা দেখলেই বুঝতে পারবেন। পরের দিন একই সময়ে আকাশ দেখলে দেখা যাবে তারাগুলো আবার একই জায়গায় ফিরে এসেছে। কিন্তু ঠিক ঠিক এক জায়গায় নয়, রোজ একটু করে তফাৎ হয়ে যাবে। তার কারণ, আর একটা ব্যাপার আছে।

নিজের অক্ষের ওপর সমানে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সূর্যের চারদিকেও সমানে ঘুরে চলেছে। একবার ঘুরতে এক বছর। আর যে রাস্তা ধরে ঘুরছে সেটা পৃথিবীর কক্ষ পথ বা কক্ষ (orbit)। আসলে রাস্তা-ঘাট বলতে তো কিছু নেই। গোলগোল কোনো রেখাও টানা নেই। কিন্তু পৃথিবী ওইখানটা দিয়েই ঘুরে চলেছে।

পাশের ছবিতে ধরা যাক, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তার কক্ষ পথে ঘুরছে। ছ'মাস পরে পরে পৃথিবীর দুটো অবস্থান দেখানো হয়েছে। দু'দিকে দুটো তারা, ধরা যাক অনেক দূরে দূরে আছে। এবার পৃথিবী যখন ১ নম্বর অবস্থানে থাকছে, ক তারাটা তখন পৃথিবী থেকে দেখলে সূর্যের দিকে আছে। তাই দিনের আকাশে দেখা যাবে না। কিন্তু খ তারাটা তখন সূর্যের উল্টো দিকে। সেটাকে তাই রাতের আকাশে দেখা যাবে। ছ'মাস পরে পৃথিবী যখন ২ নম্বর অবস্থানে আসবে, খ তারাটা তখন সূর্যের দিকে। তাই দিনের আকাশে দেখা যাবে না। কিন্তু ক তারাটা তখন সূর্যের উল্টো দিকে। তাই রাতের আকাশে দেখা যাবে। আর ছ'মাস বাদে পৃথিবী যখন আবার ১ নম্বর অবস্থানে ফিরবে, তখন আবার আগের মতো অবস্থা। তাহলে আমাদের পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশটা ছ'মাসে আধ পাক ঘুরছে, আর এক বছরে এক পাক ঘুরছে। তা বলে ছ'মাস পরে তো হঠাৎ করে আধ পাক ঘুরছে না।

পৃথিবী যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে একটু একটু করে ঘুরতে ঘুরতে ছ'মাসে আধ পাক দাঁড়াচ্ছে। তারই জন্যে রোজ যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে, ধরা যাক সন্ধ্যে ৭টায় আকাশ দেখি, আর সেই সময়ে ঠিক পুব দিকে যদি একটা তারা ওঠে, তাহলে পরের দিন দেখা যাবে সেটা ৪ মিনিট আগে উঠে এসেছে, তার পরের দিন ৮ মিনিট আগে উঠে যাবে, আর এইভাবে চলতে থাকবে। তার ফলে রোজই দেখব সন্ধ্যে ৭টায় তারাটা দিগন্ত ছেড়ে একটু একটু করে ওপরে উঠে আসছে। মাস তিনেক পরে সন্ধ্যে ৭টায় তারাটা মাথার দিকে থাকবে আর মাস ছয়েক পরে সন্ধ্যে ৭টায় দেখা যাবে তারাটা পশ্চিমে ডুবছে।

তাহলে বোঝা গেল মঘা তারাটাকে সব সময় আকাশের একই জায়গায় কেন দেখা যাবে না। দেখতে হলে কোনো দিন কোনো সময়ে আকাশের কোন দিকে থাকবে সেটা আগাম জানা দরকার। সঙ্গে আর একটা কায়দা জুড়ে দিতে পারলে ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যাবে।

প্রাচীন কালের মানুষের কাছে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জন্যে আকাশের তারাদের চেনাটা খুব জরুরি দরকার হয়ে পড়েছিল। যখন ক্যালেন্ডার ছিল না সেই সময়ে কখন কোন ফসলটা চাষ করা হবে, কখন গরু-ছাগল নিয়ে দূর দেশে চরাতে যাওয়া হবে, তারপর রাতে সমুদ্রে বা ডাঙায় যাতায়াতের জন্যে তারা দেখে দিক ঠিক করা— এরকম নানা দরকারে তারাদের চিনে রাখাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

খালি চোখে গোটা আকাশে প্রায় ৭০০০ মতো তারা দেখা যায়। এত তারাকে আলাদা করে চিনে রাখা তো চারটিখানি কাজ নয়। তাই প্রাচীনকালের মানুষ বুদ্ধি করে আকাশের এক একটা এলাকার মোটামুটি উজ্জ্বল তারাগুলোকে মনে মনে রেখা দিয়ে জুড়ে এক একটা ছবি তৈরি করেছিল। এইভাবে ছবিতে ছবিতে গোটা আকাশটাকে ভাগ ভাগ করে ফেলা হল। তাহলে ছবির মধ্যের প্রত্যেকটা তারাকে আলাদা করে চিনতে আর অসুবিধে রইল না। এক একটা ছবি নিয়ে এক একটা তারামণ্ডল (constellation)। কিছু অদল বদল করে এই ব্যবস্থা এখনো চালু আছে। আমাদের মঘা যে ছবিতে আছে, আমাদের দেশে সেটির নাম সিংহ মণ্ডল। ছবিতে গোল ফুটকিগুলো এক একটা তারা। যত বড় বড় ফুটকি, তত বেশি বেশি উজ্জ্বল। রেখা টেনে সিংহ-এর চেহারা কল্পনা করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে মাথা, পূর্ব দিকে ল্যাজ। আকাশের পুব দিক থেকে সিংহমণ্ডল যখন একটু একটু করে উঠে আসতে থাকবে তখন মাথাটা আগে ওপর দিকে রেখে উঠবে। পশ্চিমে ডোবার সময় তখন আবার মাথাটা নীচে করে ডুববে। একটু ভাবলে বা দু-চার দিন আকাশটাকে লক্ষ করলেই কারণটা বোঝা যাবে।

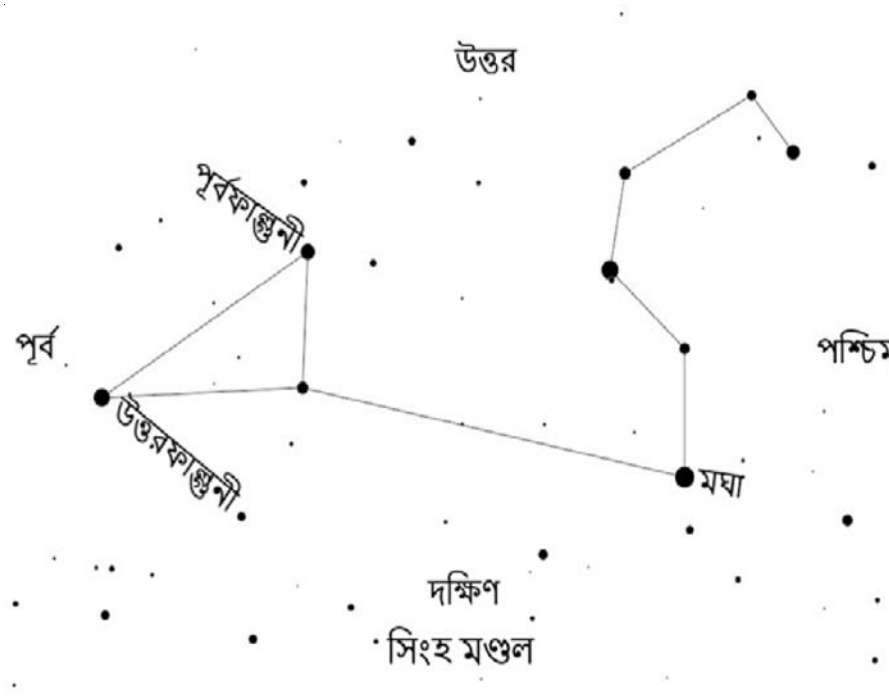

এবার ছবির সিংহ থেকে আকাশে কল্পনা করা সিংহকে মেলাতে হবে। আকাশে কিন্তু রেখা আঁকা নেই। ছবি দেখে মনে মনে এঁকে নিতে হবে। পৃথিবীর কোনো জায়গার ম্যাপে পূর্বটা ডান দিকে আর পশ্চিমটা বাঁ দিকে থাকে। আকাশের ম্যাপে উল্টোটা। কারণ পৃথিবীর জমি পায়ের দিকে আর

আকাশ মাথার দিকে। ছবিটা আকাশের দিকে ধরে উত্তর দিকটা মেলালে দেখবেন বাকি দিকগুলো মিলে গেছে। ছবিটা পুব আকাশের দিকে ধরলে বাঁ দিকটা উত্তর-পশ্চিম আকাশের দিকে— ডান দিকটা উত্তর। মাথার দিকের আকাশে আমাদের উত্তর দিকটা আকাশের উত্তর। আকাশ দেখতে দেখতে বুঝে যাবেন। অন্ধকার আকাশ হলে ভালো হয়। শহরের আলো ভরা আকাশে ছবিতে দেখানো সব তারা দেখা যাবে না। খুব অন্ধকার আকাশে ছবিতে নেই এমন কিছু তারাও দেখা যাবে। কতটা কম উজ্জ্বল তারা দেখা যাবে, সেটা জনে জনে তফাৎ হয়, আর আকাশ দেখার অভিজ্ঞতার ওপরেও অনেকটা নির্ভর করে।

অন্ধকারে ছবিটা দেখার জন্যে একটা টর্চের মুখটা কয়েক পরত লাল সেলোফেন কাগজ দিয়ে ঢেকে নিতে হবে যাতে আলোটা ভালো রকম লাল হয়ে যায়। অন্ধকারে সাদা আলোয় দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তখন কম উজ্জ্বল তারাগুলোকে আর দেখা যাবে না। শুরুতেই কম করে মিনিট পনেরো অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিলে দেখতে সুবিধে হবে।

জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সিংহ মণ্ডল পুব দিগন্ত ছেড়ে পুরোটাই উঠে আসবে। কিন্তু দিগন্তে যদি ঘরবাড়ি, গাছপালা থাকে বা দিগন্তের কাছের আকাশ ঘোলাটে থাকে, তাহলে তখনই দেখা যাবে না। আরও উঠে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। জানুয়ারির শেষে বা ফেব্রুয়ারির গোড়ায় আরও দু'ঘণ্টা আগে, সাড়ে আটটা নাগাদ সিংহ মণ্ডল দিগন্ত ছেড়ে উঠে আসবে। এইভাবে প্রতি মাসে মোটামুটি দু'ঘণ্টা করে আগে আগে উঠতে থাকবে। যত দিন যাবে সিংহ পুব ছেড়ে পশ্চিমে এগোতে থাকবে। এটা পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরার দরুন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সন্ধ্যের সময় সিংহ মাথার কাছে উঠে আসবে। তারপর পশ্চিমে ঢলতে ঢলতে জুলাই মাসের গোড়ায় সন্ধ্যের দিকে সিংহ মণ্ডলকে পশ্চিম দিগন্তে দেখা যাবে। তারপর সিংহ সূর্যের দিকে দিনের আকাশে চলে যাবে। তখন পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে আরও ঘোরার সময় দিলে অক্টোবরের গোড়ায় শেষ রাতে সিংহ আবার পুব দিকে উঠে আসবে।

আকাশের ছবিগুলো আসলে তো সবই কাল্পনিক। ফলে একই তারামণ্ডলের ছবি এক এক দেশে এক একরকম কল্পনা করা হয়েছিল। সিংহকে চিন দেশে ড্রাগন কল্পনা করা হয়েছে, আবার কোনো কোনো দেশে রথ কল্পনা করা হয়েছে। আজকে আমরা যদি সিংহের ছবিটাকে রাজহাঁস কল্পনা করি, তাহলে কিন্তু হবে না। বহু পুরাকালে কল্পনা করলে হতে পারত। সিংহের কল্পনাটা আমরা পেয়েছি সুমেরীয়দের কাছ থেকে, গ্রীকদের হাত ঘুরে। আজ থেকে ৫০০০ বছরেরও আগে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে (এখনকার ইরাকের দক্ষিণে) সুমেরীয়রা তাদের প্রাচীন নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

এবার মঘার কথা। সুপরিচিত একটি বাংলা অভিধানে মঘা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অশুভ নক্ষত্র বিশেষ'। এটা শুধু শুধু কেচ্ছা রটানো। রাজনৈতিক দল আর তাদের নেতারা এক দল আর এক দলের বিরুদ্ধে কেচ্ছা করছে, একজন আর একজনের হাঁড়ি ফাটিয়ে দিচ্ছে — তাতে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু একটা তারা, সাতে নেই পাঁচে নেই, কোনো পার্টিতেও নেই, তার বিরুদ্ধে কেচ্ছা করলে অবাক হবারই কথা। তারাটার অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না।

আসলে কেরামতিটা অভিধানের নয়। কেচ্ছা রটানোটা প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষী মশাইদের কম্ম। সেকালে আকাশের চাঁদ, সূর্য, তারা এগুলো কি জিনিস সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। এগুলোকে ঠাকুর-দেবতা, দৈত্য-দানব, আরও কত কিছু ভাবা হত। নানা পৌরাণিক গল্প জুড়ে আকাশের জিনিসগুলোর মধ্যে শুভ-অশুভ খোঁজা হত।

তখনকর ধারণায় মঘা ছিল চাঁদের সাতাশটি বৌ-এর (কি কাণ্ড !) দশ নম্বর বৌ। কল্পনার জোর খাটিয়ে মঘাকে অশুভ বানানো হয়েছিল। পেছনে লাগার কারণটা পরিষ্কার নয়। বলে রাখা ভালো, চাঁদের ১১ নম্বর আর ১২ নম্বর বৌ— পূর্বফাধনী আর উত্তরফাধনী, সিংহ মণ্ডলেরই আর দুটো তারা। এখানে পূর্বে বলতে আগে, আর উত্তর বলতে পরে বুঝতে হবে।

আগেকার দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞান (আকাশের বিষয়ের বিজ্ঞান) শুধু আকাশের জিনিসগুলো কবে কোথায় থাকবে, কবে কবে কোথায় গ্রহণ দেখা যাবে, এইসবের আগাম হিসেবনিকেশ করা আর ক্যালেন্ডার তৈরি করা, এই পর্যন্তই এগিয়ে ছিল। তখন মনে করা হত আকাশে যা কিছু আছে পৃথিবী তার কেন্দ্রে আছে, আর তাই সব কিছুই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তখনকার বিজ্ঞান যেটুকু এগিয়েছিল তাতে এরকম ভাবাটাই সম্ভব ছিল। কিন্তু মুশকিল হল, এর বাইরে নতুন কিছু ভাবা, নতুন কিছু আবিষ্কার করা, সেটা ধর্মের বারণ ছিল। কারণ ধর্ম বলত, সবকিছুই ভগবানের তৈরি আর ভগবানের ইচ্ছায় সব কিছু এইভাবে চলছে। কিন্তু বিজ্ঞান যদি এগিয়ে যায় আর দেখে যে, এতদিন যা ভাবা হয়েছিল

সেটা ঠিক নয়, দুনিয়াটা আসলে অন্যরকম, অন্যভাবে চলছে, তখন বিজ্ঞানের কাজ হবে পুরোনো ভুলগুলো বাতিল করে যেটা ঠিক সেটাকেই সামনে আনা। কিন্তু তখন তাহলে ভগবানের ইচ্ছের গল্পটা ভেস্তে যাবে। কারণ তাহলে এটাই দাঁড়ায়, ভগবান যেমনটা ইচ্ছে করেছিলেন, জগৎটা সেভাবে চলছে না। তাই নতুন কিছু বলা বারণ।

বিজ্ঞান বেশ কিছুদিন থমকে থাকার পর তাকে আর থামিয়ে রাখা গেল না। মানুষ জানতে পারল অন্য সব তারার মতো সূর্য একটা তারা, পৃথিবী সূর্যের গ্রহ আর গ্রহরা সবাই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। গ্রহরা সূর্যের আলোতেই আলোকিত হয়। সূর্যও থেমে নেই। কোটি কোটি তারার ঝাঁক মিলে গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছে। গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে সূর্য সমেত সব তারা ঘুরে চলেছে। এরকম কোটি কোটি গ্যালাক্সি আবার ছোট বড় ঝাঁক বেঁধে ঘোরাফেরা করছে। তাহলে জগতের কেন্দ্র বলতে আর কিছু থাকল না। আমাদের সূর্য যে গ্যালাক্সির মধ্যে রয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'আমাদের গ্যালাক্সি' (Our Galaxy) বা 'ছায়াপথ গ্যালাক্সি' (Milky Way Galaxy)। আমাদের গ্যালাক্সি যে ঝাঁকটায় (Local Group) আছে, তাতে ছোট বড় মিলে মোটামুটি ৮০টার মতো গ্যালাক্সি আছে।

আধুনিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) উন্নতির পাশাপাশি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান (astrophysics) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা তৈরি হয়েছে। তার কাজ হল গ্রহ, তারা ইত্যাদিরা কি দিয়ে তৈরি, কিভাবে তৈরি হল, তাদের হালচাল কিরকম, তাদের ভবিষ্যৎ কি, এইরকম আরও বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্য নিয়ে সমস্ত রকম খবর উদ্ধার করা। তার ফলে আকাশ সম্পর্কে আমাদের জানার জগৎ একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। সেই কারণে আকাশ সম্পর্কে পুরোনো সব ভুল ধারণাগুলো এখন বাতিলের খাতায় জমা পড়ে গেছে। 'লেকিন কমলি নেহি ছোড়তি'। এখনকার জ্যোতিষীরা সেই সব বাতিল ধারণাগুলোকে আঁকড়ে ধরে মানুষের ভবিষ্যৎ বাতলানোর বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

তারাদের প্রাচীন নামের বেলায় এক এক দেশে এক এক নাম। পশ্চিমের দেশগুলোতে মঘার নাম রেগিউলাস (Regulus)। লাতিন ভাষা থেকে এসেছে। মানেটা দাঁড়ায় রাজা বা রাজকীয়। আরব দেশে মঘার নাম মালিকিয় (Malikiyy), অর্থাৎ মালিক তুল্য অর্থাৎ রাজকীয়। ব্যাবিলনীয়দের দেওয়া নাম সারু (Sharru) মানে রাজা। মেসোপটেমিয়াতে নাম আমিল-গাল-উর (Amil-gal-ur)। আকাশের পৌরাণিক গল্পের এক বিখ্যাত রাজার নামে নামকরণ। পারস্যের (বর্তমান ইরান) দেওয়া নাম মিয়ান (Miyan)। ভারতীয় মঘা নামটা এসেছে মঘবান থেকে অর্থাৎ ইন্দ্রর নাম থেকে। নাম নানারকম হলেও নামের মানেগুলো খুব কাছাকাছি। তার থেকে বোঝা যায়, তখনকার কালে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকলেও দেশগুলোর মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান থেমে থাকে নি।

মঘা আমাদের থেকে ৮৫ আলোকবর্ষ দূরে আছে। অনেক অনেক বড় মাপের দূরত্ব হলে সেটা আলোকবর্ষ দিয়ে মাপা হয়। আলো ১ সেকেন্ডে যায় ২৯৯৭৯২ কিলোমিটার ৪৫৮ মিটার। পৃথিবীকে এক পাক ঘুরলে যে দূরত্ব হয়, তার প্রায় সাড়ে সাত গুণ দূরত্ব যেতে আলোর সময় লাগে ১ সেকেন্ড। এইরকম বেগে আলো ১ বছরে যে দূরত্বে যাবে সেটাই ১ আলোকবর্ষ দূরত্ব। তাহলে, মঘা আমাদের থেকে ৮৫ আলোকবর্ষ দূরে আছে বলে বুঝতে হবে, মঘা থেকে এক্ষুনি যে আলো বেরোল সেটা আমাদের কাছে ৮৫ বছর পরে এসে পৌঁছবে। ততক্ষণে বাকি কথা সেরে ফেলা যাক। মঘা আমাদের সূর্যের থেকে ১৬০ গুণ বেশি উজ্জ্বল। নীলচে সাদা রঙ। সূর্যের ৫ গুণ। তার মানে চাঁদের ২০০০ গুণ। ওপরের দিকে তাপমাত্রা ১১,৬৬৮ কেলভিন, যেখানে সূর্যের বেলায় ৫,৭৭২ কেলভিন। মঘার যা তাপমাত্রা তাতে এটাই দাঁড়ায়, মঘার কাছে চাঁদ গেলে প্রথমে গলে যাবে, আহ্লাদে নয়, সত্যি সত্যিই গলে যাবে, গরমে গলে যাবে। আরও কাছে গেলে পরে গলে যাওয়া চাঁদ গ্যাস-এ পরিণত হয়ে মঘার মধ্যে মিলিয়ে যাবে। তখন চাঁদকে আলাদা করে আর চেনা যাবে না। এমনটা জানলে যাঁরা গল্প বানিয়েছেন, তাঁরা মঘার সঙ্গে চাঁদের বিয়ে দেবার সাহস করতেন না। চাঁদের বাকি ২৬টা বৌ-এর বেলাতেও একই কথা। তবে ভালো খবরটা হল, দূরত্বের কারণে চাঁদের পক্ষে মঘার সঙ্গে মাখামাখি করাটা একেবারেই অসম্ভব।

উমা

৪৫তম আন্তর্জাতিক বইমেলায় উৎস মানুষের স্টল থাকছে। সল্ট লেকে করুণাময়ী বাস টার্মিনাস সংলগ্ন ৮ ও ৯ নম্বর গেটের মাঝামাঝি ১৭৩ নম্বর স্টলে আমাদের পাবেন।

রঙের বালতি

সুব্রত গোমেশ

ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই। তাই একটু বেলা হলে অঞ্জলি পাড়ায় বেরোল।

সম্প্রতি বাদল বাড়িতে রং করেছে। বাড়ির দেয়ালটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পেরে উঠছিল না। অনেক ঝক্কি। পাড়ার সরু গলি দিয়ে কোনো বাড়ি তৈরির জিনিসপত্র নিয়ে আসা খুব ঝামেলার, বওয়া খরচ বড্ড বেশি পড়ে যায়। সবে কাজ শেষ হয়েছে। একটা রঙের বালতি পড়েছিল উঠোনে। অঞ্জলি এসে ডাকল— ও কাকিমা তোমাদের রঙের বালতিটা নেব? আবার দিয়ে যাব। সবিতা বলল, ঠিক আছে। অঞ্জলি বালতিটা হাতে নিয়ে বালতির গায়ে লেখাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর নিজে নিজেই মাথা নেড়ে বলল— হবে। বাদল একটু হেসে বলল— কী হবে রে পাগলি? অঞ্জলি বাদল কাকার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সবিতাকে বলল— একটু বেলায় দিয়ে যাব কাকিমা।

কিছুদিন হল পাড়ায় টাইম কলে জল সরবরাহ শুরু হয়েছে। লোকজনের বেশ ভিড় হয়, তবে ফাঁকাও থাকে কখনো সখনো। সময়টা সকলের জানা তাই আগে থেকেই বালতির লাইন পড়ে। জল ভরার আগে বালতিটা বেশ কয়েকবার ভালো ধুয়ে নেয়। কেউ কেউ বাইরে থেকে ফেরার পথে পা ধুয়ে যায়। কাপড় কাচা, চানও করে কেউ কেউ।

অঞ্জলি রঙের বালতিটা নিয়ে এল কলতলায়। সকলে বলল— লাইন দে। পাড়ারই ছেলে কৃশানু মোবাইল হাতে কী দেখতে দেখতে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। অঞ্জলি বলল— এই কৃশানুটা তোর মোবাইলে টাইম মাপা যায়? কৃশানু বলল— যায়, কেন?

অঞ্জলি বলল— সেকেন্ড? কৃশানু বলল— যায়, কিন্তু কেন বলবি তো! ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন মহিলা এসে পড়েছে। অঞ্জলির ব্যাপার স্যাপার দেখে সবাই বলল— তুই নে, তাড়াতাড়ি কর, তাড়া আছে। অঞ্জলি বলল— আরে বাবা তাড়া তো সবসময় আছে, একটু দাঁড়াও না! পড়াশোনায় পাড়ায় একটা সুনাম আছে অঞ্জলির। এখন এইটে পড়ে। একটু বড় হয়েছে তাই অন্যেরা একটু সমীহই করে। কৃশানু চলে যেতে চাইল। অঞ্জলি বলল— একটু দাঁড়া না, তুই সময়টা দেখ, আমি বালতিতে জল ভরছি, এটা হল পাঁচ লিটারের বালতি— বলে বালতির গায়ে লেখাটা সবাইকে দেখিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন বলল— তাতে কী হয়েছে? ভরতে কত সময় লাগে দেখব— বলল অঞ্জলি। আশেপাশের বৌ ও অন্যান্য মহিলারা একটু চেঁচামেচি করল— এই এখন তোর খেলা করার সময় হল? অঞ্জলির ততক্ষণে কলের নীচে বালতি বসানো হয়ে গেছে। কৃশানু ঘড়ি মেলাতে শুরু করে দিয়েছে।

আশেপাশে আরো কিছু লোকজন জমে গেছে। কিছুটা কৌতূহলী দর্শকও জুটে গেছে। বালতি ভরে গেল। কত সময় লাগল রে কৃশানুদা? জিজ্ঞাসা করল অঞ্জলি। নবম শ্রেণীর ছাত্র কৃশানু বাধ্য ছাত্রের মতো উত্তর দিল— কুড়ি সেকেন্ড। অঞ্জলি বলল— তাহলে এক মিনিটে তিন গুণ, মানে পনেরো লিটার। তার মানে এক ঘণ্টায়, ষাট দিয়ে পনেরোকে গুণ করলে কত হয় রে কৃশানুদা, তোর মোবাইলে হিসেব কর তো! কৃশানু বলল— ন'শ লিটার আর দিনে কতবার জল দেয় এই কলে? উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলল অঞ্জলি। ততক্ষণে এই ছোট মেয়েটার কাণ্ডকারখানায় উপস্থিত জনতা বেশ মজা পেয়ে গেছে। বউ-ঝিদের তাড়া কিছুটা কমেও এসেছে। অঞ্জলির প্রশ্নের উত্তর দিতে সবাই উদগ্রীব হয়ে একসাথে বলে উঠল— তিনবার। আবার প্রশ্ন— কখন কখন? উত্তর— সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যেয়।

কত সময় ধরে? প্রশ্ন করল সে।

উত্তর— সকালে দু'ঘণ্টা, দুপুরে এক ঘণ্টা, সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা। তার মানে দিনে চার ঘণ্টা। কৃশানুদা। তাহলে চার ঘণ্টায় কত জল হয়? জিজ্ঞাসা করল অঞ্জলি। কৃশানুর চটপট উত্তর— ন'শ গুণ চার, মানে তিন হাজার ছয়'শ।

অঞ্জলি বলল তার মানে এই একটা কল থেকে প্রতিদিন তিন হাজার ছয়'শ লিটার জল খরচ হয়। আমি দেখেছি আমাদের পাড়ায় প্রায় কুড়িটা এইরকম কল আছে। তার মানে ঐ কুড়িটা কল থেকে কত জল খরচ হবে? কৃশানু হিসেবটা করেই ফেলেছিল। সে বলল— বাহাত্তর হাজার লিটার।

সকলের মুখ থেকে একটা চাপ বিস্ময়ের আওয়াজ বেরিয়ে এল। অঞ্জলি বলল— শুধু আমাদের পাড়াতেই এই পরিমাণ। এরকম আরো অনেক পাড়ায় এই জল সরবরাহ হয়। আর এই জল আসছে মাটির তলা থেকে। জলের পাম্প বসানো হয়েছে এইখানেই। প্রায় হাজার ফুট তলা থেকে এই জল পাম্পের সাহায্যে তুলে সরবরাহ করা হচ্ছে কেবলমাত্র পান করার জন্য। মাটির তলায় হাজার হাজার বছর ধরে এই জলসম্পদ জমা হয়ে আছে। সেটা কিন্তু অফুরন্ত নয়। একদিন শেষ হয়ে যাবে। যেমন কয়লার খনিতে কয়লা শেষ হয়ে যায়। সকলের মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া নেমে এল।

জলভরা রঙের বালতিটা সবিতা কাকিমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উঠোনে যে গাছগুলো লাগানো ছিল, আস্তে আস্তে তার গোড়ায় ঢেলে দিয়ে অঞ্জলি বলল— কাকিমা বালতিটা রেখে গেলাম।

বি: দ্র: ভারতে ২৪০০ কোটি ঘন মিটার ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার থেকে প্রায় ৮৫ শতাংশ পানীয় জলের যোগান আসে। মোটামুটিভাবে ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর ৮০ শতাংশ মানুষ— পান ও সেচ কার্যের জন্য এই ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীল।

উমা

একুশের বন্যার কান্না

ষড়ানন পণ্ডা

সবং, নারায়ণগড়, পটাশপুর, ভগবানপুর, পিংলা, ময়না, পূর্ব মেদিনীপুরের বন্যার প্রকোপ থেকে প্রায় সমগ্র অংশ রক্ষা পাবে, যদি নদীকে তার স্বাভাবিক গতিপথে পানিনালা স্রোতে সমুদ্রগামী করা যায়। পানিনালার স্রোতকে সংস্কার করে উভয় পাশের বাঁধ মজবুত করলে স্থানীয় মানুষের ক্ষতি হবে না। বরং চাষের কাজ উপকৃত হবে। এই নদীকে দক্ষিণবাহিনী করা গেলে বন্যানিয়ন্ত্রণ চিরস্থায়ীভাবে সম্ভব হবে। লক্ষ মানুষের কান্না চিরতরে বন্ধ করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমির ঢাল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

খড়্গপুর থেকে পশ্চিমে কুড়ি কিমি দূরে ঝাড়গ্রাম থানার দুধকুণ্ডি (স্থানীয় পচা খাল) থেকে একটি অতি ক্ষুদ্র স্রোত দক্ষিণ-পূর্ব মুখে এগিয়েছে। বাখরাবাদের কাছে এটি নারায়ণগড় থানায় ঢুকেছে। বাখরাবাদ থেকে এটি পূর্বগামী হয়ে মঙ্গলকাটা পর্যন্ত এসেছে। দুধকুণ্ডি থেকে নাঙ্গলকাটার দূরত্ব ১০৯ কিলোমিটার। নাঙ্গলকাটা থেকে ঢেউ ভাঙ্গা পর্যন্ত কুড়ি কিলোমিটার নদীখাতে জোয়ার-ভাটা খেলে। ঢেউভাঙ্গায় এসে কেলেঘাই কংসাবতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হলদিয়ার কাছে কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিমি ভাটিতে হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে। সবশেষে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে কেলেঘাই নদী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। কেলেঘাই-এর সঙ্গে দশটি উপনদী এবং নিকাশি খাল যুক্ত হয়েছে।

খড়্গপুর ও মাদপুরের কাছাকাছি মাওয় থেকে একটি ক্ষীণ স্রোত দক্ষিণমুখী বহতা হয়ে জুলকাপুরের কাছে বিশাল আকার ধারণ করেছে। গ্রীষ্মকালে এর কোনো অস্তিত্ব বোঝা যায় না। বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এটি বরাবর নারায়ণগড় মৌজার পশ্চিম সীমানা ঘেঁষে মাসুমপুর পর্যন্ত এসেছে। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় কুড়ি কিলোমিটার। কয়েকটি নিকাশি খাল এই স্রোতের সঙ্গে মিশেছে। এই স্রোতের নাম কপালেশ্বরী নদী। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো নদী নয়, একটি বর্ষাকালীন স্রোত মাত্র। এর উভয় পার্শ্বের কয়েকটি নিকাশি খাল এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই কপালেশ্বরী নদী মাসুমপুর-এর কাছে কেলেঘাই নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

সালদ থেকে কেলেঘাই ও কপালেশ্বরী নদী ধ্বংসের খেলায় মত্ত হল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রতি বছরই বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার বানভাসি মানুষের সমান অংশীদার আমরাও হলাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের বাঁচার দায়িত্ব নিলেন মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি। সামান্য কিছু চাল ডাল সব্জি এক ধরনের লপসি। পরিবারের লোকসংখ্যা অনুসারে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম লপসি বিতরণ করা হত। সেই খাবারের জন্য আমরা হাঁ করে বসে থাকতাম। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই আর কোনরকমের সাহায্যও নেই। ওলাওঠা, কলেরা, আমাশয় এসবের রাজত্ব শুরু হল। মড়া পোড়ানোর লোক নেই। মরা মানুষের লাশগুলো কোনোরকমে টেনে বন্যার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। এর পর এসে গেল মন্বন্তর। কত মানুষ যে মারা গেল তার কোনো হিসেব নেই। কেন এমনটা হল? এমনটা হওয়ার কারণ সম্ভবত ১৯৩৯ সালের পর নদীকে জোর করে পূর্বদিকে প্রবাহিত করা। নদীর স্বাভাবিক গতি মাটির ঢাল অনুসারে দক্ষিণদিকের রাস্তাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আমাদের আদরিণী মা কেলেঘাই নদী এবার তার ছেলেদের শুভবুদ্ধি যোগাবার জন্য বছর বছর বন্যা চালিয়ে যেতে লাগলেন। দুষ্টু ছেলে মায়ের আদর সহজে বুঝতে পারে না। সে মায়ের উপর অযথা জুলুম করে। কেলেঘাইকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত না করে পূর্বদিকে প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য কেলেঘাই-এর দক্ষিণ পার্শ্বে বাঁধকে মজবুত ও উঁচু করার ব্যবস্থা হল বছর বছর।

দেশবাসী বিধ্বংসী বন্যার নির্মম শিকার হয়েছেন। সর্বহারা নিপীড়িত নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জল আর বন্ধ হল না। মানুষ কত দিন মৌন থাকতে পারে? না, এবার মুখর হয়ে উঠল গড়ে উঠল কেলেঘাই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল নিকাশির দাবিতে গণসংগ্রাম কমিটি। এই কমিটির প্রধান কর্ণধাররা গ্রামে গ্রামে মিটিং করলেন। মানুষ কতদিন মৌন থাকতে পারে? এবার মুখর হয়ে গড়ে উঠল কেলেঘাই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল নিকাশির দাবিতে গণসংগ্রাম কমিটি। মিটিং করে সিদ্ধান্ত হয় যে কেলেঘাই নদীকে হলদি নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার খসড়া এসেছে কেন্দ্র থেকে। যদি এই পথে বন্যানিয়ন্ত্রণ না হয় তাহলে দক্ষিণমুখী করা হবে। পানিনালা

পথেই পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রতিশ্রুতিপত্র বুলেটিন আকারে বিলি করা হয়েছিল।

প্রকৃতির কার্য এবং কারণ জানা এবং অন্তর দিয়ে তা অনুভব করা এবং সেইমতো নিজের প্রতিদিনের আচরণ বা জীবনশৈলীকে পরিচালিত করার নাম বিজ্ঞানমনস্কতা।

২০০৮ সালের পর মাঝে ১৩ বছর কেটে গেছে। এলাকায় এককালীন বৃষ্টির দাপট ছিল না। সেইজন্য নদীও ফুলে-ফেঁপে ওঠে নি। সুতরাং বন্যা হতে পারে নি। কিন্তু এ বছর ২০২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের আগে থেকে একনাগাড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে গেল। প্রকৃতি মানুষের এই স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিল না। কেলেঘাই-এর দক্ষিণ পাড় বেশ মজবুত এবং উঁচু করে তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই মজবুত উঁচু বাঁধ ১৬ তারিখ রাত্রে ভোররাতে ভেঙে গেল। বিশাল গর্জন করে বন্যার জল পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবিয়ে দিল। শুধু যে চাষের জমি এবং ঘরবাড়ি নষ্ট হল তা নয়। মারা গেল বেশ কিছু গবাদি পশুও। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেলেঘাই-এর বন্যায় ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরের ক্ষতির পরিমাণ পশ্চিম মেদিনীপুর অপেক্ষা প্রায় ৫০ গুণ বেশি। পূর্ব মেদিনীপুরের বহু মানুষ আজও স্কুল বিল্ডিং-এর দোতলায় কুকুর ছাগলের সঙ্গে একসঙ্গে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন। আজও তারা নোংরা পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের সমস্ত পাকা রাস্তা এখনো জলের তলায়। দীর্ঘদিন জল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ঘাস লতাপাতা পচে গিয়ে পরিবেশটা হয়েছে পূতিগন্ধময়। পাওয়ার স্টেশনে জল ঢুকে গিয়ে দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ বন্ধ। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে জল ঢুকেছে। বহু কষ্টে দু'একটি টিউবওয়েল থেকে জল মাথায় করে আনতে হচ্ছে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ কতদিন বাঁচবে? ভাবতে অবাক লাগে আজ ২১ শতকের মানুষ আমরা গাল ফুলিয়ে বলি আমরা বিজ্ঞানের যুগের মানুষ। আমরা সামনের দিকে এগোতে পারি নি। আমরা হাঁটছি পুরাতন প্রস্তর যুগের আরো অনেক পেছনে।

শাসকগোষ্ঠীর কাছে আমাদের হাতজোড় করে আবেদন আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি নিতে বাধ্য করবেন না। কেলেঘাই নদীকে ভূমির ঢাল অনুসারে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত করার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

উমা

১৪ পাতার পর

মৌলিক অধিকারের লড়াইয়ের জন্য নেই কোনো দৃঢ় রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্যোগ। প্রশাসনিক তৎপরতার ছায়া থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের অস্তিত্ব আমরা টের পাই অতিমারীর মতন তীব্র সংকটকালে যখন আমাদের নিশ্চিন্ত সুরক্ষিত জীবনযাপনের অপর পাড়ে, প্রাণের তাগিদে, মানুষের মরণবাঁচন লড়াইয়ের জ্বলন্ত উদাহরণস্বরূপ পরিযায়ী শ্রমিকরা আবির্ভূত হয়। জীবনযুদ্ধে কেউ জয়ী হয়, আবার কেউ হারিয়ে যায় চিরতরে। সেই 'খবর' আলোড়ন সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তাদের দুরবস্থা ঘোচানোর কোনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আলোর হদিশ পাওয়া যায় না। হতভাগ্য পরিযায়ী শ্রমিকরা অবহেলা, অমর্যাদা এবং অস্বীকৃতির গহ্বরে হারিয়ে যায়।

তথ্যসূচী :

Breman, J. (2010), India's Social Question in a state of Denial. *Economic & Political Weekly*, 45(23), June 5, 42-46.

(2013), *At Work in the informal Economy of India: A Perspective from the Bottom Up*. New Delhi:Oxford University Press.

Dreze, J. & Sen, A. (2014). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*. New Delhi: Penguin Books

Sen, S. (September 16,2020) যাদের ঘরই নেই, কোন মন্ত্রে তাঁদের ঘরে বন্দি করবে প্রশাসন : ফিরব বললেই ফেরা যায়? আনন্দবাজার পত্রিকা।

উমা

তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখের সমস্যা

প্রশান্ত চক্রবর্তী

দৃশ্যমান জগতে আলোই প্রধান মাধ্যম। যা কিছু আমরা দেখি সবক্ষেত্রেই সেই বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি আমাদের চোখে প্রবেশ করে রেটিনার ওপর একটা উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। পরে অপটিক নার্ভ দ্বারা বাহিত হয়ে সেটি চক্ষুসংক্রান্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্ক সেই বস্তুকে সোজা অবস্থায় দেখতে সাহায্য করে।

বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মির তীব্রতা চোখ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু আলোর তীব্রতা খুব বেশি হলে চোখটা ঝলসে যায় এবং কিছুক্ষণ ওই চোখ দিয়ে নতুন কোনো বস্তু দেখতে পাওয়া যায় না। তবে এটা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়।

এবার আলোচনা করব কোন কোন আলোর ঝলকানিতে চোখের ক্ষতি হয়। ১। বাজি পোড়ানোর আলো— খুব কাছ থেকে বাজি পোড়ানো দেখলে তীব্র আলোকে চোখ ঝলসে যায়, তবে সেটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না অর্থাৎ চোখের দীর্ঘস্থায়ী কোন সমস্যা হয় না। বাজিতে চোখের ক্ষতি হয় প্রধানত জ্বলন্ত ফুলকি চোখে পড়লে। তার তাপে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া বাজির মশলার উপকরণ চোখে আটকে থাকে এবং মশলার এবং বাজির ধোঁয়ার রাসায়নিক পদার্থ চোখের কর্নিয়া কনজাংটিভা এবং চোখের পাতার ক্ষতি করে। চোখের ক্ষতি নির্ভর করে স্ফুলিঙ্গর আকার ও তার তাপ-এর ওপর। চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয় কখনো সখনো। অথচ যাদের চশমা আছে তারা যদি চশমা পরে এবং যাদের চশমা নেই তারা যদি গগলস বা আইশিল্ড ব্যবহার করে বাজি পোড়ায় তাহলে কোনো সমস্যাই হয় না। ২) ওয়েল্ডিং ফ্ল্যাশ— ওয়েল্ডিং করার সময় যদি বিশেষ প্রতিরোধক চশমা বা শিল্ড ব্যবহার না করে সরাসরি ফ্ল্যাশের দিকে তাকায় তাহলে চোখ কিছুক্ষণের জন্য ঝলসে তো যায়ই সেই সঙ্গে কর্নিয়া ও কনজাংটিভা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার ফলে চোখে তীব্র যন্ত্রণা, জল পড়া ও কড়কড় ইত্যাদি হয়— তবে এই সমস্যা হয় কয়েক ঘণ্টা পরে। চোখে টপিক্যাল অ্যানাস্থেশিয়া জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করলে আরাম হয়। কাজেই সরাসরি ওয়েল্ডিং ফ্ল্যাশের দিকে না তাকানোই ভালো। ৩) ফার্নেস-এর আলোয় চোখের সমস্যা— যে সমস্ত কর্মী ফার্নেসে কাজ করেন তাঁদের চোখে ফার্নেসের লাল আলো বা ইনফ্রারেড আলো চোখের কর্নিয়া ও কনজাঙ্কটিভার ক্ষতি তো করেই, এমনকি চোখের রেটিনার ক্ষতি করে, তার ফলে দৃষ্টিহীনতা হতে পারে। কাজেই এসব কাজ করার সময় প্রতিরোধক চশমা ব্যবহার করে কাজ করলে এত সমস্যা হবে না। ৪) লেজার রশ্মিতে চোখের ক্ষতি— চোখে লেজার রশ্মি পড়লে চোখের কর্নিয়া, কনজাংটিভা লেন্স ও রেটিনার ক্ষতি করে। কতটা ক্ষতি হবে তা নির্ভর করবে লেজার আলোর তীব্রতা এবং কতক্ষণ রশ্মি চোখে পড়ছে এবং কতটা সরাসরি পড়ছে তার ওপর।

লেজার রশ্মি পড়ার পর মাথাব্যথা হতে পারে চোখের সামনে কালো কালো বস্তু ভাসতে দেখা যেতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণ জল পড়তে পারে, তাছাড়া হঠাৎ সব কিছু ঝাপসা দেখা যেতে পারে। লেন্স-এর ওপর লেজার রশ্মির প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ছানি হতে পারে। রেটিনার উপর এর প্রভাব মারাত্মক হতে পারে যার থেকে দৃষ্টিহীনতা হতে পারে।

সম্প্রতি শ্রীভূমির পূজায় ব্যবহৃত লেজার লাইট পাইলটদের অসুবিধা সৃষ্টি করে। পুজোর সময় রাস্তায় এই লেজার আলোর ব্যবহার গাড়িচালকদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। আমার পুত্র এইরকম তীব্র আলোর ঝলকানিতে তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। সরকার এবং পূজা সংগঠকদের এ বিষয়ে যথেষ্ট নজর দেওয়া প্রয়োজন। ৫) ইলেক্ট্রিক ফ্লাশ বা বিদ্যুৎ চমকানোর আলো খুবই ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় চোখের তেমন ক্ষতি হয় না। **উমা**

সংগঠন সংবাদ

গত ১২ নভেম্বর ২০২১ ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, হরিণঘাটা শাখার উদ্যোগে বড়জাগুলিতে ডাক্তার হেনরি নর্ম্যান বেথুনের ৮২তম প্রয়াণ (১২ নভেম্বর ১৯৩৯) দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে হরিণঘাটা শাখার উদ্যোগে এই প্রথম ডাক্তার বেথুনের প্রয়াণ দিবস পালিত হল। ভোরবেলা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। কমিটির সদস্যরা চীন বিপ্লবের সময় নরম্যান বেথুনের অবদান নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। ডাক্তার হেনরি নর্ম্যান বেথুন-এর জীবনের নানান ঘটনা নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ হয়। —

নিরঞ্জন বিশ্বাস, সম্পাদক, ডা. দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, হরিণঘাটা শাখা

পুস্তক পর্যালোচনা

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

১। সোনালী অনুপাতের রহস্য— ড. বরুণকুমার দত্ত পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষদ। প্রকাশ- মে, ২০১৯। মূল্য - ৭০ টাকা। পৃষ্ঠা - ৪০

২। প্রসঙ্গ মৌলিক সংখ্যা— ড. বরুণকুমার দত্ত পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষদ। প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি ২০২০। মূল্য - ৮০ টাকা। পৃষ্ঠা- ৪৮

দুটো বই-ই অঙ্ক নিয়ে লেখা, আর লেখকও এক। সেজন্য আমার মনে হয়েছে, একসাথেই দুটো বই নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

যে দুই বিষয় নিয়ে লেখক বই দুটো লিখেছেন, সেগুলো অঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ সোনালী অনুপাত ও ফিবোনাচ্চি শ্রেণী এবং মৌলিক সংখ্যা। প্রথম বইতে পাঁচটি অধ্যায়ে (যদিও 'লেখকের কথা'-তে ৬টি অধ্যায়ের কথা লেখা আছে!) তিনি সোনালী অনুপাত, ফিবোনাচ্চি শ্রেণী কি, তাদের বৈশিষ্ট্য এবং এই দুই ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বইটি পড়লে বিষয়বস্তু সম্পর্কে এক সাধারণ ধারণা পাঠকের হবে এটা আমার বিশ্বাস।

ঠিক একই কথা মৌলিক সংখ্যা প্রসঙ্গে। মৌলিক সংখ্যা কি, কিভাবে এটা নির্ণয় করা যেতে পারে, মৌলিক সংখ্যার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ব্যবহার নিয়ে ৬টি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটা পাঠকের মৌলিক সংখ্যার ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ তৈরি করতে পারবে।

তবে কিছু সংশোধন করতে পারলে হয়তো বই দুটোর মান কিছুটা বাড়তে পারে। যেমন, প্রতিটি বইয়ের শেষে লেখকের গবেষণাপত্রের একটা সারণি দিয়েছেন। এটা কি প্রয়োজনীয়? বইয়ের ব্লার্বে তো গবেষণাপত্রের সংখ্যা লেখাই আছে! প্রথম বইয়ে 'সূচিপত্রে'র পরে মানবদেহে ফিবোনাচ্চি অনুপাতের উপস্তিতির ছবি দেওয়া হয়েছে। সেটা যথাস্থানে দিলে ভাল হয়। ফিবোনাচ্চির ছবি দু'বার দেওয়া হয়েছে। আর অঙ্কের বইয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি একটু চোখে লাগে। (ঐশ্বরিক সংখ্যা শুধু না, পল ডিরাকের এক উদ্ধৃতিও যোগ করা হয়েছে!) এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে নোবেল বিজ্ঞানীর লিওঁ লেডারম্যানের হিগস বোসন নিয়ে একটা বিখ্যাত বই— *The God Particle*. God damn Particle থেকে কিভাবে The God Particle হল সে ইতিহাস সবার জানা।

পর্যালোচক পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠকও বটে। ফিবোনাচ্চি সংখ্যা নিয়ে উৎস মানুষের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ ফিবোনাচ্চি ও তার রহস্য সংখ্যার শিরোনামে লেখকের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার উত্তরে জানু-মার্চ ২০১৯-এ এক পাঠক লেখেন 'ফিবোনাচ্চি নয়, পুরোধা হেমচন্দ্র'। আরো জানা যায় যে বর্তমানে সংখ্যাটি হেমচন্দ্র-ফিবোনাচ্চি শ্রেণী বা সংখ্যা নামে স্বীকৃত। চিঠিতে তথ্যসূত্রও দেওয়া ছিল। আশা করেছিলাম যে বইটিতে তার উল্লেখ থাকবে। আবার বলছি, বই দুটো অঙ্ক নিয়ে লেখা ভাল দুটো বই। উ মা

আবেদন

প্রিয় গ্রাহক, উৎস মানুষ পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যাতে সংগঠন সংবাদ থাকে। যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যারা বিজ্ঞানমনস্কতার সপক্ষে, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিপক্ষে, বিশেষ করে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে নিজের বা আশপাশের এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হবে এমন কোনো কুসংস্কারবিরোধী আলোচনা সভার, পণপ্রথা, দেহদান, চক্ষুদান, অঙ্গদান, জল সংরক্ষণ, পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা শিবির, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, জ্যোতিষচর্চা যে ভুয়ো বিজ্ঞান— এইসব বিষয়গুলি ছাড়াও বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাধানাথ সিকদার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা এরকম সব মানুষদের নিয়ে আলোচনা সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সঙ্গে ছবি থাকলে ভাল হয়, কবে ও কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেল (থাকলে) দিয়ে সরাসরি আমাদের পাঠান।

পরিচালকমণ্ডলী উ মা